চশমা খোলো - গল্প বলো

অমৃতা দাশগুপ্ত

Abstract

In this article I focus ona selection of prose byAbanindranath Tagore and the genealogy of reading *roopkatha* or fabled tales. In the initial part of the essay I discuss nineteenth-century journals related tochildren's literature. In this partthere is adeliberation on how far *roopkatha*was conceived as children's entertainment and how farthey had an underlyingmoralizing tendency. Many authors of Bengali Literature chose*roopkatha* as a means of self-expressions. In the cusp of the nineteenth and twentieth century in the hands of Rabindranath*roopkatha*became a medium of fullest creativity and self-expression. As in fairy tales of Europe of the time, an attempt to present social history through the lens of folkloric literature could be noticed here as well. In the second part of the paper I establish the argument that collecting folklores from thetowns and villages of Bengal, that began under the leadership of Tagore and Dinesh Chandra Sen, as an 'anthologizing activity' may be discerned as a new problematic trajectory for the history of *roopkatha.*

Abanindranath Tagore appeared as a major icon in the late nineteenth and early twentieth century in the discourse of *roopkatha*;he not only influenced the narrative, but affected the very tone, image and flavour that constituted the ambience of *roopkatha.*Unlike Rabindranath,he would remain entranced in a world of his own, that thrived on the incredible, baffling and carnivalesque 'willing suspension of disbelief.'He obliterated anything that had the appearance of concrete information! He detested a narrative that even remotely seemed to be didactic. In place of design he preferred story-telling, suggestive of an oral style. Abanindranathsustained the trend, created by Trailakyanath Mukhopadhyayin his novel *Kankabatiwhich*had entirely overturned the readers' sense of rationality.Thus fiction earlier considered only for children, became oriented to the ubiquitous reader irrespective of age. Abanindranath wrote for *that* reader solely, who eternallywaited for the quirky with an eye of faith in an imaginative frame of mind.

Key words: roopkatha, Abanindranath Tagore, children's literature, folklore, carnivalesque

।। ১ ।।

অবনীন্দ্রনাথ এর গদ্যরচনা প্রসঙ্গে উজ্জ্বল মজুমদার জানাচ্ছেনঃ 'একাধারে চিত্রশিল্পী ও কথকের ভূমিকা নিয়ে বাংলা গদ্যচর্চায় হাত দিয়েছিলেন বলেই প্রথম থেকে তিনি বাঙলা গদ্যের গতানুগতিকতাকে এড়াতে পেরেছিলেন।'[১]

বস্তুত 'শকুন্তলা' (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৯৫) রচিত হওয়ার তিন বছর আগেই এক উদ্ভট–এর জগৎ বাংলা সাহিত্যে তৈরি হয়েছিল। সময় তারিখ বলতে গেলে ১৮৯২ (কার্তিক, ১২৯৯), 'কঙ্কাবতী'র প্রকাশ। এই উপন্যাসটি ঘিরে বেশ অনেকদিন পর্যন্ত পাঠক মহলে আর বিদগ্ধ মগজেএকরকম আলোড়ন তো চলছিলই, যাকে বলা যেতে পারে 'পাঠ প্রতিক্রিয়া'। এই পাঠ প্রতিক্রিয়া যে কোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে সুলভ তো নয়ই, বরং অনুপস্থিত বললেও বাড়াবাড়ি হয় না। সেদিক থেকে কঙ্কাবতীও অন্যান্য বাংলা বই এর মধ্যে খানিকটা ব্যতিক্রম, কেননা প্রকাশিত হওয়ার পর পরই রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা (সাধনা, ১২৯৯ ফাল্গুন ইং১৮৯২) থেকে আরম্ভ করে, ২০১০ অবধি উত্তরাধুনিক সমালোচনা (রনবীর লাহিড়ী, ভূমিকা, নির্বাচিত ত্রৈলোক্যনাথ, চর্চাপদ, ২০১০, জানুয়ারি) পর্যন্ত আমাদের সামনে প্রতিক্রিয়াগুলি লিখিতভাবে উপস্থিত।

১২৯৯, ২ / ১ ফাল্গুন (১৮৯৯) সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায়, উপন্যাসটির নানা চেহারা স্তরে স্তরে আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়। এর মধ্যে যে বাক্যাংশটি এই সামান্য প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক, তাকে উদ্ধৃত করছি ঃ 'এই উপন্যাসের প্রথম ভাগে প্রকৃত ঘটনা, দ্বিতীয় ভাগে অসম্ভব অমূলক অদ্ভূত রসের কথা। এইরূপ অদ্ভূত রূপকথা ভালো করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ।'[২]

কঙ্কাবতী উপন্যাসের জাত নির্ণয় নিয়ে, সর্বপরি ত্রৈলোক্যনাথের রচনার ধরণ ধারণ নিয়ে পাঠকের জগতে এই উদ্বেগকে বরাবরই লক্ষ্য করা যায়। শ্রী রনবীর লাহিড়ী নির্বাচিত ত্রৈলোক্যনাথের ভূমিকা অংশে এমনই একটা উদ্বেগের ইতিহাসকে আলোচনা করেছেন। এই উদ্বেগের সূচনবিন্দু বোধ করি রবীন্দ্রনাথ, যিনি কঙ্কাবতীকে ('অসম্ভব অমূলক অদ্ভুত রসের কথা' এবং সেই কারণেই এটি একটি 'রূপকথা' এমন একটা যুক্তিক্রমে বেঁধে ফেলেছিলেন। সাধনা পত্রিকার বহুচর্চিত ভূমিকাটিতে রবীন্দ্রনাথ কঙ্কাবতীতে একই সঙ্গে 'উপন্যাস' এবং'রূপকথা' দুটি নামেই ডাকতে থাকেন। বরং আর একটু স্পষ্ট ভাগ করে দেন এই বলে যে গল্পটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রকৃতভাগে প্রথম ঘটনা, দ্বিতীয়ভাগে অসম্ভব অমূলক, অদ্ভুত রসের কথা।

আখ্যানের দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে রূপকথার প্রাধান্য, তবু রূপকথার উপাদান থাকলেও কঙ্কাবতী যে রূপকথা নয় উপন্যাসই এবংকঙ্কাবতী পাঠের আসল মজাই যে উপন্যাস ও

রূপকথার দ্বন্দ্ব নিয়ে — একথা উত্তর–আধুনিক সমালোচকদের মতামত হলেও রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন অদ্ভূত অমূলক রসের রূপকথাটি আসলে 'বালক বালিকাদের উপযোগি সরল গ্রন্থ।'[৩] আর এই রূপকথা জাতীয় সরল গ্রন্থটি লেখবার জন্য এতদিনে শিশুদের দুনিয়ায় হাজির হয়েছেন একজন লেখক, যিনি 'আমাদের দেশের বালক বালিকাদের এবংতাহাদের পিতামাতার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে।'[৪]

একথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ, 'তাহাদের পিতামাতার' কথা উল্লেখ করেছিলেন। তবু এই অদ্ভূত অমূলক রসের উপন্যাস এর আবির্ভাব যে একজন শিশু সাহিত্যিক এর প্রতিশ্রুতি জানিয়েছিল— ভূমিকাটি পড়ে সে কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। পরবর্তীকালে সজনীকান্ত দাস স্পষ্টতই নাকচ করেন 'শিশুসাহিত্যিক' এর এই তকমা। কেননা সজনীকান্তের মতে ত্রৈলোক্যনাথের আপাত মজার পিছনে সর্বদাই লুকিয়ে আছে ক্ষুরধার তিক্ত সত্য। স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গ সাহিত্যে তিনি রাজা।[৫] সুতরাংএকদিকে সিরিয়াস সাহিত্য প্রণেতা ত্রৈলোক্যনাথ অন্যদিকে অনাবিল মজা আর কৌতুক এর ত্রৈলোক্যনাথ এই দুই এর টানাপোড়েনে উত্তর–আধুনিক কাল পর্যন্ত তাঁর রচনাগুলি একটা বিতর্ক জারি রেখে দিল। বাস্তবধর্মী উপন্যাস অঘোষিতভাবে কেমন করে রূপকথার পরিসরে বারবার ঢুকে পড়ছিল, সেটাই বোধ করি তার রচনার সব থেকে কৌতূহলের জায়গা।

কিন্তু শিশুসাহিত্যের যে দাবী ১৮৯৯ সালে রবীন্দ্রনাথ তুলেছিলেন, তার মুক্তি ঘটা সহজছিল না। শিশুসাহিত্যের আপাত চেহারাটি খুব সরল নয়। শিশুসাহিত্যের কাছে উনিশ বিশ শতকের দাবী কি, একথা বোঝার জন্য মুদ্রিত গ্রন্থ নয়, বরং জরুরি হয়ে ওঠে শিশুসাহিত্য সংক্রান্ত পত্রিকাগুলি, কেননা বাংলা শিশুসাহিত্যের বিকাশ যে সময়ে, তখনো বাংলা সাহিত্য বহুলাংশে পত্রিকানির্ভর।

১৮৭৮ এর বালকবন্ধু যা প্রথম সর্বাঙ্গীন শিশু পত্রিকা তার মূল উদ্দেশ্য বা 'agenda' উনিশ শতকের আধুনিকতায় প্রাপ্ত নতুন শিক্ষা, নতুন আলোয় শিশুমনকে আলোকিত করা। নতুন যুগের নবীন মানুষ হিসেবে সেই সব বীজকে অঙ্কুরেই এমন সার প্রদান করা যা তাদের বিজ্ঞানমনস্ক, নৈতিক চরিত্রে দৃঢ়, পরিপূর্ণ একটি মানব হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাটির ভরকেন্দ্র দুটি বিষয়ে বিন্যস্তঃ ১) বিজ্ঞান ও সংস্কার মুক্তি, ২) মরাল বা নৈতিক চরিত্র গঠন।

তাহলে কঙ্কাবতী'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যে ছেলেদের 'মনোরঞ্জন' আর 'মনোহরণ' করবার কথা বললেন, সে চর্চা শুরু হতে তখনো খানিক দেরী। শিশু সাহিত্য সংক্রান্ত পত্রিকাগুলি তখন ছুটে চলেছে একাগ্র মনে— উনিশ শতকের ছেলেদের নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য।

'সখা'–র সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন। প্রথম প্রকাশ : ১৮৮৩ খ্রীঃ। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই সম্পাদক কোন অপরিচ্ছন্নতা এবংঅস্পষ্টতা না রেখে সরাসরি পত্রিকার ভাবনা ও উদ্দেশ্য জানিয়ে দেন। এর মধ্যে দুটি সূত্রকে উল্লেখ করা খুব জরুরি বলে মনে করি।

(ক) 'লেখা প্রসঙ্গে শিক্ষক এবংঅভিভাবকের পরামর্শ থাকতে পারে। থাকলে তা সাদরে গ্রহণ করা হবে।'

(খ) 'বালক বালিকাদের উপকারে আসতে পারে– এমন রচনা, সংবাদ, সত্য–ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদের কাছে পাঠালে– তাও সাদরে গৃহীত হবে।' (সখা /১৮৮৩ / সংখ্যা ১ / সম্পাদকীয়)

সংবাদ অর্থাৎ তথ্য, আর বিবরণ– যাকে হতে হবে সত্য। এই দুটি বৈশিষ্ট্য একটি শিশু পত্রিকার। ভাবতে আশ্চর্য লাগে তবে অমূলক কল্পনা, স্মৃতিভারাতুর চিন্তা, 'অকৃত্রিম হাসি', 'কৈশোরের আবেগ', 'অকারণ উল্লাস'– এ সবের বদলে তথ্য আর সত্য বিবরণ (fact, truth নয়) কিম্বা নৈতিক চরিত্র গঠনে হিতকারী উদ্যোগ ঃ এই তবে উনিশ শতকের শিশু পত্রিকার দাবী?

এ সত্য কোন সত্য? 'এনলাইটেনমেন্ট' বা 'আলোকিকতা' যুগের সত্য? যেখানে যুক্তি বা rationality মূল কথা? শিশুকেও ছোট থেকে যুক্তিবাদী শিক্ষায় বড় করতে হবে। আষাঢ়ে ভোজবাজির গল্প তখন যেন নিজের মধ্যে স্ববিরোধ। অথচ শিশুর কাছে সবচেয়ে সত্য তার কল্পনার জগৎ। তার বানিয়ে তোলা স্বপ্নপুরী।

'সখা' পত্রিকার পর তার কাছাকাছি সব কটি পত্রিকারই বিষয় নীতিগল্প, উপদেশ ও উপাসনা, বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার, শিশু স্বাস্থ্য, বিজ্ঞানশিক্ষা, ধাঁধা। মনোরঞ্জন বা আজগুবি অমূলক রচনা নেই বললেই চলে। এমনকি 'উপকথা' বা 'আখ্যানমালা' শিরোনামে গল্পগুলোও নীতিধর্মে বোঝাই করা। ব্যতিক্রমী রচনা একেবারেই নেই, এমন নয়; যার নাম প্রথমে মনে পড়ে, তিনি লিখছেন 'সখা' পত্রিকাতেই ১৮৮৫–র জুলাই সংখ্যায়। রচনাটি/গল্পটিতে রয়েছে রাজা রাজপুত্র। রয়েছে সোনার কাঠি–রূপোর কাঠির, ঘুম পাড়ানো আর জেগে ওঠা। চেহারা চরিত্র লক্ষণে যা আদি অন্তে একটি 'রূপকথা'। এই গল্পের নামটি শুধু সংকেতধর্মী নয়, বরংভবিষ্যতে বাংলা রূপকথা ইতিহাসকে নতুন দিশা দেবে এমন একটি নতুন নাম– 'নতুন গল্প'। 'রূপকথা' শব্দের ব্যবহার তখনো মুখে মুখে ফেরে না। 'নতুন গল্প'র ঠিক একবছর আগে (১৮৮৪) বঙ্কিমের উপন্যাস দেবী চৌধুরানী– তে পাওয়া গেছে এই পরিভাষাটির উল্লেখ।[৬] প্রথম উল্লেখ সম্ভবত ১৮৫৮ হুতোম প্যাঁচার নকশায়।[৭] ১৯০৭ এর ঠাকুরমার ঝুলির আগে রূপকথা জনমানসে খুব প্রচলিত কোনো পরিভাষা ছিল না। রাজা–

রাজপুত্রকে নিয়ে রূপকথার আদলে গল্পটি লিখলেও, উপেন্দ্রকিশোর তার নাম দিলেন 'নতুন গল্প'। এ গল্পে উপদেশের বালাই নেই। আছে কল্পনার উড়ান আর অজানা দেশের সন্ধান।

১৮৮৬ ফেব্রুয়ারি মাস থেকে 'সখা' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে শিবনাথ শাস্ত্রী রইলেন আর 'আখ্যানমেলা' সিরিজের দায়িত্বে এলেন অন্নদাচরণ সেন। গল্প কখনো আরব দেশের, কখনো জার্মানির। গল্পের শেষে শিক্ষার আসর কিন্তু বহাল রইল। যেমনটি করে গিয়েছিলেন প্রমদাচরণ। হিতোপদেশের গল্প যেন। রূপকথার ধাঁচ এ সব গল্পে অনুপস্থিত। অন্যদিকে 'সখা'র ৫ম ভাগ অর্থাৎ ১৮৭৭–র সংখ্যাগুলোর সম্পাদনা অন্নদাচরণ সেন করেন। গল্প বলছেন শিবনাথ শাস্ত্রী। সহজও সাবলীল ভাবেই, প্রাঞ্জল ভাষায়। কিন্তু নীতিমূলক গল্প। এই ধারাই বয়ে যাবে– এরপর যখন শিবনাথ শাস্ত্রী 'উপকথা' গ্রন্থটি লিখবেন। দেখা যাবে বিদেশী রূপকথা ও তার অনুবাদে ৫টি গল্প ঃ (১) ঠাকুরের মেয়ে। (২) না বুঝে করিলে কাজশেষে হায় হায় (৩) সখের যাত্রার দল (৪) হংসরূপী রাজপুত্র (৫) হাতকাটা মেয়ে। গল্পগুলির শিরোনাম এবংগ্রন্থ প্রকাশনা 'নীতি বিদ্যালয়' কর্তৃক, দেখে সহজেই অনুমেয় গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে নৈতিক চরিত্র গঠনই লেখকের মূল উদ্দেশ্য।

'সখা'র পর ১৮৯৪ সালে 'সখা' ও 'সাথী' পত্রিকা মিলিত ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে 'সখা ও সাথী' নামে। তবে তার আগে ১৮৮৫ খ্রীঃ শিশুসাহিত্য পত্রিকার একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস 'বালক'। 'বালক' পত্রিকা কেবল শিশুসাহিত্য নয় গোটা বাংলা সাহিত্যের মুখ উজ্জ্বল করে দাঁড়িয়ে। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদক হলেও 'বালক'–এর যাবতীয় দায়িত্ব সামলাতেন যুবক রবীন্দ্রনাথ। 'বালক' পত্রিকার সূত্র ধরে দেখি 'শিশুসাহিত্য' ধারণাটিকে নতুন করে ঢেলে সাজাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। শিশু তার কাছে শিশু নয় কেবল। শিশু তার বোঝা এবংনা–বোঝা নিয়ে সব অর্থেই পাঠক। শিশুসাহিত্যের জন্য আলাদা কোন ন্যাকামি বা ছেলেমানুষী অথবা নীতির ভারে আক্রান্ত চরিত্র গঠনের কোন অসন্তব ইচ্ছাও তার নেই। রবীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য সংক্রান্ত ধারণাটি অনেকটাই এই পত্রিকাকে ঘিরে গড়ে ওঠে। আর ঐ শতকেই 'শিশুসাহিত্য' ধারণাটি পশ্চিম থেকে আগত একটি নতুন আমদানি, জুড়ে বসে আমাদের চৈতন্যে।

অন্যদিকে বসন্ত কুমার বসু সম্পাদিত 'প্রকৃতি'র ৪র্থ বর্ষ/১৩১০ (ইং১৯০৩) সংখ্যায় 'বঙ্গের গ্রাম্য সাহিত্য' নিয়ে পরপর তিনটি প্রস্তাব লিখছেন আবদুল করিম। ছাত্রদের আহ্বান জানাচ্ছেন, বিলোপ পাচ্ছে এমন প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারকাজকরার জন্য। নিজেকে বলছেন 'দীন মাতৃভক্ত'। জাতীয়তাবাদের সুরটি সহজেই টের পাওয়া

যায় তার আবেদনে। ছড়া সংগ্রহ, ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ, লোককথার খোঁজ, খুব সহজেই এর দুবছর পর প্রকাশিত (১৯০৭) ঠাকুরমার ঝুলিকেও এই সুরে বেঁধে দেয়। করিম সাহেব মনে করিয়ে দেন, হাতে লেখা ছাড়াও এই সব সাহিত্য মানুষের হৃদয়পটে অঙ্কিত। নিম্নে সেইসব সাহিত্যের একটি তালিকা যদি দেখি, যা আবদুল করিম এই প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ করেন। তা এইরূপ ঃ ১) মৌখিক প্রাচীন গীত ২) ছড়া ও বারমাস্যা ৩) হেঁয়ালী ও ধাঁধা ৪) প্রবচন ৫) প্রবাদ ৬) ব্রতকথা ৭) উপকথা ৮) ডাক ও খনার বচন ৯) পালা ১০) রহস্য কথন ১১) নীতি কবিতা ১২) সারিগান।

তাহলে দেশমাতৃকার ভান্ডারে লুপ্ত যে সাহিত্যের উদ্ধারকাজেছাত্রেরা ব্রতী হবে সেখানে 'রূপকথা' নামের কোনো রূপভেদ নেই। নেই কেন না রূপকথার গল্প বলে ১৯০৭ পরবর্তী সময়ে আমরা যা চিনতে শিখেছি, তা পুরোটাই ঐ ৭ নংউপকথায় লীন হয়ে রয়েছে। ১৯০৭ পরবর্তী সময়ে আমরা 'রূপকথা' নামের ব্যবহারটিকে আস্তে আস্তে জনপ্রিয় হতে দেখব।

।।২ ।।

'The body of written works and accompanying illustrations produced in order to entertain or instruct young people'

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা 'children's literature' বা 'juvenile literature' বোঝাতে এমন একটি জুতসই সংজ্ঞা দিচ্ছে। লক্ষ্য করবার মত বাক্যবন্ধটি 'entertain or instruct' । মনোরঞ্জন অথবা নির্দেশদান। ভাবনা আর কল্পনা যদি একহাতে শিশু মনোরঞ্জনের জন্য প্রসারিত হয় তবে অন্য হাত জ্ঞান আর নীতির দিকে নির্দেশ দান করে। গোটা পৃথিবীর এবংউনিশ শতকের বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য ও পত্রিকাগুলির দিকে তাকালে এই মনোরঞ্জনের ভিতরকার নিঃশব্দে বয়ে চলা চোখ রাঙানিটুকু দেখতে পাওয়া যাবে।

শিশু সাহিত্য শব্দটির ব্যপ্তি অনেকটাই। ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে, ছবির বই, সহজপাঠ্য, ঘুমপাড়ানি গান (lullaby), ছড়া (rhymes), উপকথা (fables), গাথা এবং প্রাথমিকভাবে সেই সব কিছু যা মৌখিক উৎস থেকে সংকলিত।

বিদগ্ধ সমালোচক ও মনীষীরা এ ব্যাপারে প্রায় একমত যে শিশুসাহিত্য একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (পাশ্চাত্য), কিন্তু তখন তার নিজেরই শৈশব। বিশ শতকে তার চেহারা নতুন কলেবরে এমন হয়ে উঠল,

যাকে বলা যেতে পারে তার পূর্ণ বিকাশ। শিশুসাহিত্যের পাঠক যে শিশু তার বয়সসীমাকে যদি চিহ্নিত করতে যাই, তবে প্রথম সমস্যার সামনে পড়তে হয় (১) বয়ঃক্রম অনুযায়ী শিশুসাহিত্যের পাঠক কারা? যে অর্বাচীন বালক ছবি দেখে লেখা জুড়ে নেয়, আর যার অক্ষরজ্ঞান হয়েছে, বুদ্ধি ও বোধের দৌড় যার আর একটু বেশি, অথবা যে কৈশোরে পদার্পন করল– এরা প্রত্যেকেই একই পাঠক নয়। সুতরাং বয়সের বিভিন্ন স্তরে রসগ্রাহিতার বিপুল তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং, 'infant' থেকে 'young' পর্যন্ত 'শিশুসাহিত্য' শিশু, বালকদের এবং কিশোরদের। শুধু কি তাই? প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যেমন থাকে একটা শিশু মন, তেমনি চারপাশের বাস্তবতায় প্রতিনিয়ত বেড়ে উঠছে যে শিশু, তাও এগিয়ে যাচ্ছে একটা পরিণত মন এর দিকে। এভাবে দুদিকের টানে, দুটি বিশেষত্ব ও বৈপরীত্যেই বেড়ে উঠেছে শিশুসাহিত্য। 'শিশুসাহিত্য' গোটা শব্দটির ভরকেন্দ্র তাই 'শিশু' নয়, 'সাহিত্য' শব্দটির ওপরে। শিশুদের জন্য হল কিনা বড় কথা নয়, ভাল সাহিত্য হল যে সেইটেই মূল কথা। যেমন বলেছিলেন লীলা মজুমদার। ছোটদের বই যখন বড়রাও পড়তে পারে, বুঝতে হবে, বইটি শিশুসাহিত্য হিসেবে ভালো। যেমন ভালো 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যান্ড'। এ কি কেবল শিশুপাঠ্য? এই আজগুবির জগৎ তো বড়দেরও। যেমন ত্রৈলোক্যনাথের উপন্যাস। অথবা প্রশ্নটিকে আরো জোরদার করা যেতে পারে। এ কি আদৌ শিশুপাঠ্য?

শিশুসাহিত্যের সূচনা যেমন দেরীতে হল, তেমনি তার ক্রমবিকাশও ঘটছিল ধীর গতিতে, এবং সমস্ত দেশ কাল জুড়ে শিশু চরিত্রগুলিও নিশ্চয়ই একরকম ছিল না। পশ্চিমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা সাহিত্য জুড়ে যে বাস্তবতা এবং সাহিত্যিক প্রবণতার বদল ঘটল, তেমনি শিশু চরিত্রেরও একটা বদল ঘটছিল। জীবনের আরো জটিলতার বিষয়গুলি– যেমন শ্রেণী সচেতনতা, যুদ্ধ, যৌনতা বৃহত্তর সাহিত্য সীমানা থেকে শিশুমনকেও ছোঁওয়ার চেষ্টা করছিল। তবু শিশুসাহিত্যের এই প্রসার তো হালের ঘটনা। তার আগে পশ্চিম থেকে পূবে, উনিশ শতকে (বাংলা সাহিত্যে) বিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত সেই আদি অকৃত্রিম বিতর্কটি জারি রইল ঃ

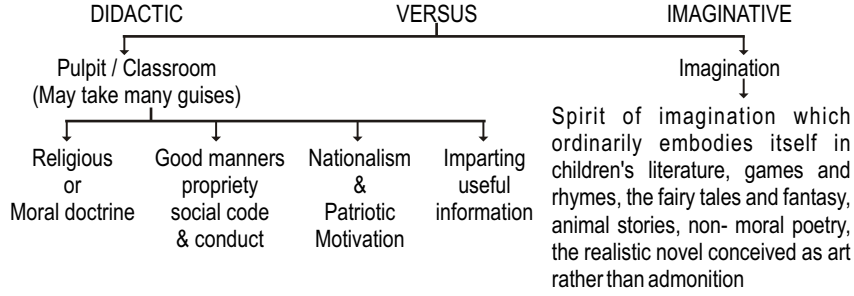

[Diagram taken from Encyclopaedia Britannica]

মূল বিতর্ক তবে শুরুতে একটাই, শিশুসাহিত্য নীতিমূলক জ্ঞানগর্ভ শিক্ষামূলক বিবৃতি নাকি কল্পনার উড়ান? দেখতে গেলে উনিশ শতকের শিশু সংক্রান্ত পত্রিকাগুলি কিন্তু নীতিশিক্ষার ক্লাশরুম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনিতে উনিশ শতকের 'শৈশব' যে একটা নতুন নির্মিতি, তাকে যে আসলে স্তরে স্তরে বানিয়ে তোলা হল একথা বিস্তারে আলোচনা করেছেন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা শিশুসাহিত্যে ছোট মেয়েরা' গ্রন্থটিতে। শিশুর জন্য বহুদিন যেখানে বরাদ্দ ছিল 'নির্দিষ্ট কালিক খন্ড' কিন্তু সেই কালের মধ্যে শৈশবকে আর ধরে রাখা গেল না। এই প্রসঙ্গে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মনে করিয়ে দেন– 'আমরা যাকে আজ শৈশবদশা বলে জ্ঞান করতে স্বতই অভ্যস্ত তা আদতে এই সেদিনের নির্মিতি।'[১০]

১৮৩৫ এ মেকলের ইংরেজিশিক্ষার বিল, তার আগে ছাপাখানার আয়োজন আর ১৮৫৩ তে চালু হল ট্রেন– এই সব নিয়ে যখন গড়ে ওঠে নতুন কলকাতা, 'ইংরেজিশিক্ষা ছাড়া যা প্রায় অসম্পূর্ণ'। উনিশ শতকে 'নতুন করে ঢেলে সাজানো', নতুন এই 'সাহিত্যবর্গ'– যার নাম 'শিশুসাহিত্য'। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে প্রায় পত্রিকাগুলিই বাংলা ভাষাচর্চাকে পেরিয়ে জীবনের দীক্ষা আর সংযত নৈতিকতার বিরামহীন অনুশীলনী চালাতে থাকে। শিশু শব্দটি ব্যপ্ত হয়ে পড়ে বাল্যবয়স ছাড়িয়ে কৈশোর পর্যন্ত। বিশ শতকে হেন প্রসঙ্গ নেই, যা শিশুসাহিত্যে উত্থাপিত হয় না। অভীষ্ট পাঠক তখন শিশু প্রাপ্তবয়স্ক দুজনেই। নাবালক সাবালকের জল অচল ভেদ নেই সেখানে।

।।৩।।

'ছেলেরা যে বই পড়িবে তাহার কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না, এইরূপ বিধান থাকা চাই। আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম, যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না– দুই–ই আমাদের মনের উপর কাজকরিয়া যাইত।'

ঘরের পড়া/জীবনস্মৃতি

শিশুসাহিত্য প্রসঙ্গে সবচেয়ে জরুরি কথাটি প্রথম বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যেখানে ছোটদের আর বড়দের বই এর মধ্যে পার্থক্য কিছু থাকবে না। বস্তুতঃ শিশুসাহিত্য কথাটি ব্যবহৃত হয় ১৮৯৪ সালে 'সাধনা' পত্রিকাটির আশ্বিন–কার্তিক সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের মেয়েলি ছড়া প্রবন্ধে (পরবর্তীকালে যা ছেলে ভুলানো ছড়া নামে গৃহীত) এছাড়াও যোগীন্দ্র সরকার সংকলিত 'খুকুমণির ছড়া' (১৮৯৯) বইয়ের ভূমিকায় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভূমিকায় 'শিশুসাহিত্য' পরিভাষাটিকে পাওয়া যায়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'খুকুমণির ছড়ার' ভূমিকায় মনে করিয়ে দিয়েছিলেন লোকসাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথই প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রায় সব সমালোচকই এ ব্যাপারে একমত যে শুধু ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশ নয়, সব দেশের শিশুসাহিত্যই জুড়ে আছে লোকসাহিত্যের সঙ্গে। কেননা লোকসাহিত্য মানেই ছেলেভুলানো ছড়া, ঘুম পাড়ানিয়া গান, উপকথা, কিংবদন্তী নীতিগল্প। শিশুসাহিত্যের বুনিয়াদ হিসেবে স্বীকৃত এইসব সাহিত্যরূপ তাই শিশুসাহিত্যের অন্তর্গত।

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আরও সহজ হয়ে ওঠে কেননা রবীন্দ্রনাথ ছড়া সংগ্রহের কাজকরছিলেন যখন, বয়স্ক ও প্রবীণরা যে কেবল উদ্যোগই নেন নি তা নয়, তাঁরা নিঃসাড়ও। তাঁর এই কর্মকান্ডে প্রবীণ বিদগ্ধের তেমন সাড়া পাওয়া যায় না যে এর প্রমাণ 'সাধনা' পত্রিকার সর্বত্র ছড়িয়ে। কেবল ছোটরাই এসব ছড়া ও গল্প থেকে 'অন্তহীন আমোদ পাচ্ছে'। সুতরাংএই লোকসাহিত্য তো শিশুসাহিত্যের অন্তর্গত। এই পর্যন্ত এসে দুটি অনিবার্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে 'রূপকথা' সাহিত্য রূপটিও।

(১) ঘুমপাড়ানিয়া গান, ছড়ার মত রূপকথা অবধারিতভাবে জুড়ে যাচ্ছে লোকসাহিত্যের সঙ্গে। আর মৌখিক লোকসাহিত্য শিশুসাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

(২) সুতরাংঅনিবার্যভাবেই রূপকথা ছোটদের (মূলতঃ)।

অথচ রূপকথা এমন একটি সাহিত্যবর্গ যা সরাসরি নীতিদান প্রসঙ্গে মাথা ঘামায় না। তার পুরো দায়টাই মনোহরণ–এর। তাহলে কঙ্কাবতীর ভূমিকায় (১৮৯২) রবীন্দ্রনাথ ছেলেমানুষদের 'মনোহরণ'–এর যে কথা বলেছিলেন, উনিশ শতকীয়

আলোকপ্রাপ্তির যুগে নীতিগর্ভ জ্ঞান সঞ্চারে তা অনেকটাই চাপা পড়েছিল। নীতি শিক্ষকদের চোখ রাঙানির ভেতর থেকে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো একটা গল্পের ধারা বয়ে যাচ্ছিল, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মনোরঞ্জন। সম্পূর্ণরূপে একটি মনোহরণকারী সেকুলার গল্পের শাখা, স্বভাবত রোমান্টিক।

শিশুসাহিত্য
(উনিশ থেকে বিশ শতকের গোড়া)

নীতিগর্ভ শিক্ষাদান (INSTRUCTION)	**মনোহরণ (ENTERTAINMENTS)**
[গল্প যদি বিষয় হয়] – তবে তা লোকগল্প, নীতিগল্প, কিংবদন্তী, পুরাণ, উপকথা [রূপকথা শব্দটিকে প্রায় পাওয়াই যায় না]	গল্প – লোকগল্প, কৌতুক গল্প, রূপকথা (বিশেষত ১৯০৭ পরবর্তী)।

রূপকথা লোকসাহিত্যের অন্তর্গত তাই শিশুপাঠ্য, এমন একটা ধারণা প্রায় গোটা বাঙালি জনমানসে একুশ শতক পর্যন্ত ছেয়ে রয়েছে, যদি না মনে রাখা যায় রবীন্দ্রনাথের সাবধান বাণী যা ছোটরা বুঝবে এবংবুঝবে না, এই দুই নিয়েই তাদের পড়ার জগৎ তৈরি হবে। যদি না মনে রাখা যায় লীলা মজুমদার–এর অভিজ্ঞতা ছোটদের বই যদি বড়রাও ভালোবেসে পড়তে পারে তবে বুঝতে হবে বইটি ভালো হয়েছে।[১১]

তার জন্য কোনো স্তর বিভাজনের দরকার নেই। দরকার নেই শিশু থেকে বড় পর্যন্ত তাকে ধাপে ধাপে বয়ঃক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে তোলার। কেননা তার সব থেকে বড় কারণ ছোটদের লেখা অবোধের সাহিত্য রচনা নয়। তাকে করুণা করে লেখা চলে না। ছোটদের বলা যায় না সেসব, তাই তাদের জন্য আলাদা করে কোনো 'স্পেস' তৈরি হোক, এমন কথা ভাবেননি তিনি। ঘুম পাড়ানি ছড়া যেমন নিজের ছন্দে শিশু মনের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাকে আপনি দুলিয়ে দেয়, তেমনি সব সাহিত্যকর্মই, যদি তা সুসাহিত্য হয় তা শিশুর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে– এমনই কোন বিশ্বাস তাঁর ছিল। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়–এর কথায়– 'সব রকমের জল মেশানো তরলতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদ বারংবার স্মরণীয়।'[১২]

।।৪।।

> বাংলা সাহিত্যে অনেকেই এই রূপকথাকে আত্মপ্রকাশের উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন: অবনীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, লীলা মজুমদার– এঁদের লেখা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। কিন্তু সব আগে, বাংলা সাহিত্যের অন্য সব বিভাগের মতো, সাহিত্যের এই নিঃসঙ্কোচ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নাম না করলে অন্যায় হবে।[১৩]

রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, লীলা মজুমদার প্রমুখদের প্রসঙ্গে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়–এর এই মত। বিশ শতকে রূপকথা আত্মপ্রকাশের বাহন হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে। 'আত্মপ্রকাশের উপায়' শব্দটিতে আমরা বিশেষ মনোযোগ দেব, তবে তার আগে বিশ্বসাহিত্যে রূপকথার জেগে ওঠাটা কেমন, দেখে নিই। রোমান সাহিত্যে মধ্যযুগ থেকেই লোককথা সংকলনের একটি ধারা অব্যাহত। ফ্রান্সে শার্ল পেরো আর তারপর গ্রিমভাইদের সংকলন (১৮১২) নৃতত্ত্ব ভাষাতত্ত্ব এবংসমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক দিকবদলের ইঙ্গিত হয়ে রইল। লোকসাহিত্যের চেহারা থেকে সামাজিক ইতিহাসকে দেখবার ঝোঁক তখন ইওরোপের নানা দেশেই ছড়িয়ে পড়ছিল।

> কিন্তু অন্য এক ধরণের রূপকথাও আছে, যেখানে জগতের সব রহস্যময় বিশ্লেষণবিমুখ ঘটনাও চকিতে নতুন–নতুন অর্থে ভরে যায়।... নিছকই প্রচলিত রূপকথার সুলিখিত রূপ এগুলি নয়– সম্পূর্ণ নতুন উদ্ভাবনা, সব অর্থেই যাকে বলা যায় 'রচনা' যার ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন স্বয়ংলেখক – কোনো গোষ্ঠী বা জাতি নয়।[১৪]

অন্য এক ধরণের রূপকথা– আর আগের রূপকথা, কি নামে, কি পরিভাষায় পৃথক করব তাদের? ধ্রুপদী/প্রাচীন রূপকথা আর আধউনিক রূপকথা?

এই দ্বিতীয় রূপকথাটি সবচেয়ে বেশি লিখেছিলেন ডেনমার্কের হান্স খ্রিষ্টিয়ান আণ্ডেরসন। মানুষের মন, পাখির হৃদয়, পশু কিম্বা জলকন্যাদের গতিবিধি সবই তার যেন জানা। শরীরটা রূপকথার কিন্তু আসলে তা ভেতরে ভেতরে অন্যরকম, খেয়াল খুশীর জগৎ। অসকার ওয়াইল্ড–এর স্বার্থপর দৈত্য থেকে কার্লো কল্লোদির কাঠের পুতুল, পিটার প্যান থেকে চার্লস কিংসলের নোংরা দুষ্টু টম, সাতেকজুপেরির ছোট্ট রাজকুমার থেকে হিমেসেনের প্লাতেরো নিজেদের মত এক পথ তৈরি করল।

ভালোবাসা আর বিষণ্ণতায় ভরা এই পথেই মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খুঁজেপেলেন রবীন্দ্রনাথকে– লিপিকা আর গল্পস্বল্প, কিম্বা 'সে'–র রচনায়।

ইওরোপের এই পথ চলা কি একইরকম ভারত তথা বাংলার ক্ষেত্রও? উনিশ বিশ শতকে? আপাত একটা মিল থাকলে একেবারেই কি এক? বাংলাদেশ যখন আলোকপ্রাপ্ত তখন সাহিত্যিকদের অনেকেই লোকসাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করলেন। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ১৮৯৯/১৯০০–র আগে থেকে চলছিল যে ছড়া সংগ্রহের কাজ, সেখানে জাতির আবেগ, ভাষার খোঁজপ্রাথমিক আগ্রহের বিষয় হলেও রবীন্দ্রনাথ সাধনা পত্রিকার ভূমিকাতেই জানালেন– কেবল জাতির ইতিহাস রচনার দায় নয়, ঐ ছড়াগুলোর 'কাব্যমূল্য' সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ গভীর। দীনেশ সেন ও রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে বাংলাদেশের বেশ ক'টি অঞ্চল জুড়ে পায়ে হেঁটে, জলে ভেসে, দক্ষিণারঞ্জন সংগ্রহ করলেন যে গ্রাম্য উপকথাগুলি, তাকে লিখে এবার হাজির করলেন বিশ শতকের আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত পাঠকের সামনে– আমরা পেলাম বাংলা সাহিত্যের নতুন একটি লিখিত সাহিত্যরূপ– 'রূপকথা'।

সুতরাংজাতি বা গোষ্ঠীর যে রূপকথা যা আদিকাল থেকে চলে আসছে এমন একটা কিছুকে যদি মেনে নিতে হয়, তবে কি তাকে দ্বিতীয়বার লেখা যায়? নাকি লিখতে গেলেই সেটা আসলে রূপক হয়ে ওঠে? তাহলে 'অন্য এক ধরণের রূপকথা' যা আসলে লেখকের আত্মপ্রকাশ, তা কি কেবল নতুন একটা রূপকথা নাকি রূপকধর্মী (allegory) রচনা?

(ক) বাংলা রূপকথার ক্ষেত্রে 'সময়' একটা বড় প্রশ্ন তৈরি করে। প্রথম সংকলিত যে বাংলা রূপকথা– ঠাকুরমা'র ঝুলি/১৯০৭ তার আগেই অবনীন্দ্রনাথ–এর লেখায় (শকুন্তলা/ক্ষীরের পুতুল হাজির হয়েছে) এসে হাজির হয়েছে রূপকথার জগৎ। এসে গেছে ত্রৈলোক্যনাথের আজগুবীর জগৎ– (১৮৯২/কঙ্কাবতী)। লেখা হয়ে গেচে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প– 'অসম্ভব কথা'। যার বাইরের শরীরটুকু প্রচলিত 'উপকথা'র, অথচ ভেতরে ভেতরে বয়ে চলে বিশ শতকের বিষণ্ণতা – যা একেবারেই আধুনিক সময়ের চিহ্ন। তাহলে প্রাচীন/ধ্রুপদী রূপকথা (দক্ষিণারঞ্জন) বা সংকলিত রূপকথার আর সৃষ্টির জগতের (অবনীন্দ্র/রবীন্দ্র) এর মধ্যে একটা কলাবিপর্যয়–এর সম্ভাবনা এসে হাজির হয়। তার অন্যতম প্রমাণ : বুদ্ধদেব বসু'র– বহুচর্চিত 'বাংলা শিশুসাহিত্য' প্রবন্ধটি।

'বাংলা শিশুসাহিত্যে দুই যুগ দেখিয়াছি ; প্রথমে সরল, সংকলনপ্রধান, বিশুদ্ধরূপে শিশুসেব্য; তারপর উদ্ভাবনে নিপুণ, উপকরণে বিচিত্র, অংশত প্রবীণপাঠ্য।'[১৫]

এই গাণিতিক নিয়ম বাংলা রূপকথার ক্ষেত্র স্বতঃসিদ্ধ হয়ে ওঠে না। পূর্বে সংকলন (তা জাতি/গোষ্ঠীর ইতিহাস) আর পরে সৃষ্টি (তা লেখকের আত্মপ্রকাশ) এমন সরল সমীকরণকে গোলমাল করে দেয়। সংকলনের পূর্বেই অবনীন্দ্রনাথের কলমে সৃষ্টির পথ জেগে ওঠে। এমনকি রবীন্দ্রনাথ আন্ডারসনধর্মী রূপাকারে বিষণ্ণতাও ছোটগল্পে উঁকি দিয়ে যায় ঠাকুরমা'র ঝুলি সংকলনের ঢের আগে।

(খ) কালবিপর্যয়–এর এই প্রবল বিপাকে কিন্তু আমাদের পড়তেই হয় না, যদি আমরা একটু বুঝে নিই শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারকে। আজীবন সাহিত্যিক হওয়ার বাসনা নিয়ে যিনি লেখার জগতে পা রাখলেন, ১৯০৩ এর প্রকৃতি পত্রিকাতে তাঁর কবিতা প্রবন্ধে নজর করলেই দেখা যাবে– মধুসূদন আর বঙ্কিমী মডেলে তিনি হাত মকশো করছেন। এর পর পরেই রবীন্দ্রনাথ ও দীনেশ সেন এর উৎসাহে তিনি লিপিবদ্ধ করছেন – গ্রাম্য উপকথা বলার ভঙ্গি, অবিকল হুবহু সেই সব শব্দ আর ভঙ্গির মিশেলে লিখছেন গল্প। এতদিনের মুখে বলা গল্প চেহারা পাচ্ছে তার লেখায়; রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ, দীনেশ সেন এর ও, ভাষাগত বদল করা চলবে না, হুবহু তুলে আনতে হবে। তবু দক্ষিণারঞ্জন বাদ দেন কিছু গ্রাম্য উপভাষা ও প্রয়োগ। বলার ভঙ্গিতে সহজকরে লেখেন নতুন গল্প। তারপরও কি বলতে হবে তিনি কেবলই সংকলক? লেখক নন? এই কি সেই চূড়ান্ত মুহূর্ত নয় যখন মুখে বলা উপকথাগুলি দক্ষিণারঞ্জনের সাহিত্যগুণেই হয়ে উঠছে 'রূপকথা'? রূপকথা তাই লোককথার কেবল একটি শাখা বিশেষ নয় – যাতে রাজারানী পক্ষীরাজের গল্প থাকে। 'রূপকথা' – এতদিনের মুখে বলা উপকথার (বিশেষ একটা স্বভাবের) লিখিত রূপ। বিশ শতকের আধুনিকতার ছোঁয়ায় তৈরি হওয়া নতুন সাহিত্যরূপ। অথচ আমাদের স্মৃতিতে রূপকথার বিস্তার এমনই যেন তা আদি অনন্তকাল ধরে— এভাবেই ছিল আমাদের কাছে।

(গ) ১৯০৭ এ 'রূপকথা সংকলন' পরিভাষাটি ব্যবহার হওয়ার আগে কতবার আমরা পেয়েছি 'রূপকথা' শব্দটিকে? প্রায় হাতে গোনা সেই ব্যবহার। 'বালকবন্ধু' থেকে 'সখা', 'সাথী', 'মুকুল', 'প্রকৃতি', 'সন্দেশ' প্রায় সব কটি শিশু পত্রিকাতে 'রূপকথা' শিরোনামে কোনো গল্পই পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলে 'উপকথা' অথবা 'আখ্যান'। 'সাধনা'র ছড়া সংগ্রহের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে এবং মেয়েলি ছড়ার প্রবন্ধে কয়েকবার, হাতে গোনা প্রায় 'রূপকথা' পরিভাষাটি প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়।[১৬]

মূলত ১৯০৭ এ এবং ১৯০৮ এ দক্ষিণারঞ্জন বাংলা রূপকথার সংকলন বলে যথাক্রমে ঠাকুরমা ও ঠাকুরদার ঝুলিতে নির্বাচিত কিছু গল্পকে লিখলেন– সেই লিখিত

সাহিত্যরূপটিই বাংলা রূপকথার ইতিহাস সূচনা করল। মুখের গল্প– লেখায় অবিকল নিয়ে আসতে গিয়ে এক নতুন লেখার ভঙ্গি সাহিত্যে ঠাঁই পেল। উপকথার এই লিখিত রূপটিই রূপকথা, যা বিশ শতকের একটি বিশেষ সাহিত্যরূপ। তারপর থেকে গোটা বঙ্গ জনমানসে ঐ ক'টি গল্পের ভঙ্গি নিয়ে যত গল্প স্মৃতিতে ভিড় করে এল, ছোটবেলার সব চেনা–শোনা গল্পই 'রূপকথা' পরিভাষাটির পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মনে হল আদিগন্ত কাল ধরে 'রূপকথা' বলে গল্পের এক ভাগ ছিল– তা কালিদাসের কাল থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত বিস্তার পেল। 'সময়ের' এই ছবিটা যেন এইরকম ঃ

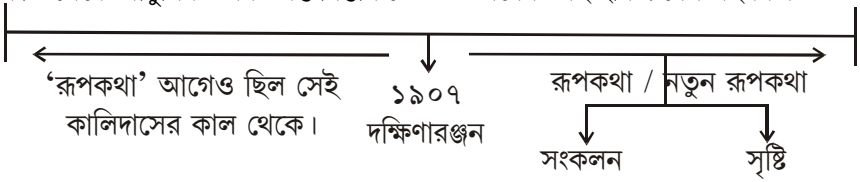

অর্থাৎ দক্ষিণারঞ্জনের সংকলনের আগেও রূপকথা ছিল, পরেও রূপকথা রইল, মাঝখানে তিনি কেবল সংকলন করলেন কিছু গল্পকে, আর তারপর থেকে শুরু হল আরো সংকলন আর তারপর নতুন রূপকথা কিম্বা সৃষ্টির জগৎ।

কিন্তু সময়ের চেহারাটি কি অনেকটা এই দ্বিতীয় ছবির মত নয়?

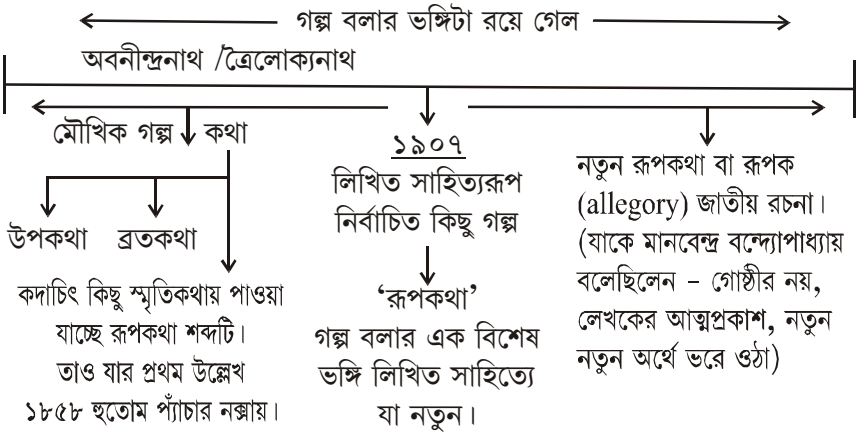

এমনকি ১৯০৭ এর আগে যখন অবনঠাকুর কিম্বা ত্রৈলোক্যনাথ এর লেখা এল– বোঝা গেল, মুখে বলা গল্প লেখার জগৎ জুড়ে বসেছে।

আবার যদি একটু ফিরে যাই – পুরোনো একটি প্রসঙ্গে যখন রবীন্দ্রনাথ ছড়া

সংগ্রহের কাজেচিঠি লিখছেন দিকে দিকে – কথা বলছেন নানা মানুষজনের সঙ্গে, একটি বিষয়েই তিনি বারবার জোর দিচ্ছেন – তা হল অপরিবর্তিত অবস্থায় সংরক্ষণ। প্রসন্নকুমার রায়ের সহধর্মিনী সরলা রায়কে রবীন্দ্রনাথ ১৭ আষাঢ় ১৩০০ বঙ্গাব্দে শিলাইদহ কুমারখালি থেকে একটি চিঠিতে অনুরোধ করছেনঃ'আপনি যদি পূর্ববঙ্গ হইতে আপনাদের আত্মীয় পরিচিত কাহারো নিকট হইতে যথাসম্ভব আহরণ করিয়া দিতে পারেন ত বড় উপকার হয়। ছড়া যতই অর্থহীন সামান্য তুচ্ছ এবংচলিত হউক না কেন আমার নিকট তাহা বহুমূল্য। ... যদি এরূপ সংগ্রহক্ষম কাহাকেও পান তবে তাঁহাকে বলিয়া দিবেন যেন গ্রাম্যতা বা কুরুচি দোষের জন্য কোন ছড়া বাদ না দেওয়া হয় এবংঅর্থহীন শব্দসমষ্টিকেও সামান্য জ্ঞান না করেন।'[১৭]

অর্থহীন, সামান্য, তুচ্ছ, চলিত, গ্রাম্যতা, কুরুচি দোষ এসব থাকা সত্ত্বেও ছড়া সংগ্রহ অপরিবর্তিত বা হুবহু সংগ্রহের আর্জি যেমন জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, প্রায় তেমনই সংগ্রহ করা গিয়েছিল। স্মৃতিতে ছন্দ নির্ভর পদ্যবন্ধ শব্দগুলি অবিকল থাকার সম্ভাবনাও অনেক বেশি। বরংনতুন করে তাকে লেখার থেকে যেমনটা শোনা যায়, তেমন নিয়ে আসা অথবা স্মৃতিতে তাকে সেভাবেই বহন করা স্বাভাবিক। যেমন– 'দুধের বাটি তপ্ত, খোকা হলেন খ্যাপ্ত'। অথবা, 'খোকা যাবে বেড়ু করতে তেলিমাগিদের পাড়া। / তেলিমাগিরা মুখ করেছে কেন রে মাখনচোরা।' এক্ষেত্রে 'খ্যাপ্ত' কিম্বা 'তেলিমাগি' গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হয়েও ছন্দবদ্ধ অবস্থাতেই সংরক্ষিত হয়ে যায় সহজে, কিন্তু গদ্যের ক্ষেত্রে সেই একই নিয়ম খাটে না। গল্পে তো আরোই না। বিশ শতকের পাঠককে গল্প বলতে গেলে তাকে যে মার্জিত করে আনতে হবে অনেকটাই, একথা দক্ষিণারঞ্জন বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর সাহিত্যিকের মন দিয়ে। তাই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কিম্বা দীনেশ সেন এর আফশোষ ছাপিয়ে রবীন্দ্রনাথ এর ভূমিকা উজ্জ্বল হয়ে জেগে থাকে।

প্রাদেশিক, আঞ্চলিক তুলনামূলক কম শোনা শব্দগুলি যে গল্প শোনার ক্ষেত্রে অন্তরায় হতে পারে, একথা আঁচ করে দক্ষিণারঞ্জন বুঝেছিলেন, এদের ভাষাতাত্ত্বিক মূল্য ছাড়া সাধারণ পাঠকের কাছে আর কোনো মূল্য নেই। সুতরাংছড়ার মত একই নিয়মে যে গ্রামীণ কথ্যভাষাকে হুবহু, অবিকল তুলে আনলে বিশ শতকের পাঠক তাকে গ্রহণ করবেন না, একথা বোধ করি দক্ষিণারঞ্জন আগেই আন্দাজকরতে পেরে নিজের প্রতিভাগুণে অপূর্ব এক গ্রহণ–বর্জনের সমতা তৈরি করলেন। একদিকে ছেঁটে দিলেন গ্রামীণ কথ্য ভাষাকে, অন্যদিকে রক্ষা করলেন কথার রস, বলার ভঙ্গি। দিদিমা–ঠাকুরমার গল্প বলার ভঙ্গিটিকে লেখায় নিয়ে এলেন অথচ স্বাদেশিকতার জোয়ারে সংগৃহীত ছড়া গাথা প্রবাদে দেশের শিকড় খোঁজার দায়ে ভাষা বা অর্বাচীন শব্দের

বিশুদ্ধতা রক্ষা করার যে দায় সংকলকদের ওপর পড়েছিল, তাকেও সযত্নে এড়িয়ে গেলেন। ছড়া সংগ্রহের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়েছিলেন এই সব সংগ্রহের মূল কারণ যে দেশীয় ঐতিহ্যের শিকড় সন্ধান, তেমনি এর 'কাব্যমূল্য'ও তার কাছে কিছু কম নয়। দক্ষিণারঞ্জনের মনের মধ্যে যে সাহিত্যিক বাসা বেঁধেছিল, তিনি দ্বিতীয় অংশটিকেই বেশি প্রাধান্য দিলেন এমনকি এই বিরাট যজ্ঞের অন্যতম পুরোধা দীনেশ সেন–এর চোখ রাঙানিটুকু পর্যন্ত গ্রাহ্য করলেন না। তাই পরবর্তীকালে সুকুমার সেন যখন 'রূপকথা' কে অপৌরুষেয় বলেন[১৮] –তখন দক্ষিণারঞ্জনই সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান সব ইতিহাসের মাঝে। তাকে যদি আমরা কেবল গ্রিমদের মত জাতীয় গল্পের সংকলক হিসেবে দেখি, তাহলে উপকথা–কথা সম্প্রদায়ের গল্পগুলি যার সাহিত্যগুণে বিশ শতকের নতুন সাহিত্যরূপে 'রূপকথা' নাম নিল– এই ইতিহাসকেও অগ্রাহ্য করা হয়।

এ যাবৎকাল রূপকথার ইতিহাসকে যেমনভাবে দেখা হয়েছে– সেই ধরণটিকে মনে রাখলে আগের রূপকথা আর পরের রূপকথায় এমন একটি দ্বন্দ্বের সারণী চোখে পড়ে :

কালিদাস থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত সংকলন	**১৯০৭ পরবর্তী সৃষ্টি**
দক্ষিণারঞ্জন	রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ
প্রাচীন	আধুনিক
গোষ্ঠী বা জাতির ইতিহাস	ব্যক্তির / কবির আত্মপ্রকাশ
জাতির আবেগ	সাহিত্যমূল্য অধিক/ স্বভাবে আধুনিক
হুবহু অবিকল	নতুন নতুন অর্থে ভরে ওঠা
গ্রিম (বিদেশী সাহিত্যের তুলনামূলক বিচার)	আন্ডারসন
শিশুসাহিত্য	কখনো কখনো বড়দের
মূল উদ্দেশ্য জাতির ঐতিহ্য রক্ষা	সাহিত্য সৃষ্টি

কিন্তু সময়ের মাপটা অবিকল এমন নয়। আর তার মূল নির্ধারক হয়ে ওঠেন দক্ষিণারঞ্জন। দক্ষিণারঞ্জনের অবস্থানটুকু বদলে গেলেই, রূপকথার ইতিহাসের এক বদল চোখে পড়ে।

।। ৫ ।।

> বাংলা শিশুসাহিত্যে দুই যুগ দেখিয়াছি; প্রথমে সরল, সংকলনপ্রধান, বিশুদ্ধরূপে শিশুসেবা ; তারপর উদ্ভাবনে নিপুণ, উপকরণে, বিচিত্র, অংশত প্রধানপাঠ্য। ... কিন্তু এই সীমাচিহ্ন, ইতিহাসের খুঁটি, এই সুবিধাজনক কাজচালানো ব্যবস্থা – সমস্ত ভেঙে পড়ে, অর্থ হারায়

> যখন আমরা অবনীন্দ্রনাথের সম্মুখীন হই। দুই যুগে ব্যাপ্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গার সেতুবন্ধী সওদাগর।[১৯]

দুই যুগ ব্যপ্ত করে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি অবনীন্দ্রনাথ। বুদ্ধদেব বসুর মতে রবীন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথ এর মিল একজায়গায় আর অমিল তার রূপায়নে। মিল, 'তাঁদের সহজাত স্নেহশীলতা, আর জীবনের মধ্যে চিরশিশু উপলব্ধি ; রূপায়নের ক্ষেত্রে কিছু মিল নেই। দুজনের তফাৎ অর্থে ছোটদের উপযোগি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে সত্যিকারের ছোটদের বই একখানাও লেখেন নি। সেটা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে, তিনি যে বড্ড বেশি বড়ো লেখক।'[২০]

উদ্ধৃত লাইনটির দুটি অংশ। (১) অবনীন্দ্রনাথের বই সর্বজনীন হয়েও আলাদা অর্থে ছোটদের উপযোগী আর (২) রবীন্দ্রনাথ পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে সত্যিকারের ছোটদের বই একখানাও লেখেন নি। অন্যদিকে উদ্ধৃত করি মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এর উক্তি 'সত্যিকারের ছোটদের বই তাঁর মাত্র একটি হয়তো : সহজপাঠ।'[২১] বস্তুত এই প্রসঙ্গে দুই কালের দুই শিশুসাহিত্য সমালোচক বুদ্ধদেব বসু এবংমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একমত যে 'সহজপাঠ' বা পাঠ্যপুস্তক রবীন্দ্রনাথের লেখা একমাত্র ছোটদের বই। কথার গরমিল তার পরের অংশে। বুদ্ধদেব বসুর মতে — আর সব বই বড়দের বোঝবার মত, ছোটদের বই লেখা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে, কেননা তিনি যে বড় বেশি লেখক। অন্যদিকে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হাজির করেন, এক দীর্ঘ তালিকা। বলেন, 'ভাবতে ভালো লাগে, আজকের বাংলাদেশে কোনো ছোট ছেলে ইচ্ছে করলে এভাবেই রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের জগতে প্রবিষ্ট হতে পারে।'[২২]

যে বইগুলি দেখে বুদ্ধদেব বসুর মনে হয় এইসব বড়দের বই, সেই তালিকা দেখেই মানবেন্দ্র বলেন — ছোট ছেলে ইচ্ছে করলেই ঢুকে যেতে পারে তার মধ্যে। কেননা যে কোন তরলতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ, তাই অধেক জানা, অধেক শোনা, অধেক বোঝা'র মধ্যে দিয়েই ছোটদের জগৎ তৈরি হয়। তবে কি রবীন্দ্রনাথ বড়দের? আর অবন ছোটদের? রূপকথা অথবা রূপকথাধর্মী গদ্য (অবনীন্দ্রনাথ) ছোটদের আর রূপকের জগৎ বড়দের? অবনীন্দ্রনাথকে, রূপকথাকে ও এই শিশুসাহিত্যের অন্তবর্তী কিম্বা 'ছোটদের উপযোগি' বলে দেখবার প্রবণতা অন্তত শেষ অর্ধশত বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে আসছে। এই প্রবণতার অন্যতম কারণ বোধহয় সেই একটিই বিষয়গত বিচার (content analysis)। যার লেখায় রূপকথার মত অলৌকিক আজগুবী ঘটনা ঘটে, তা ছোটদের বই কি। কিন্তু রূপকথার আমেজ যখন পুরো লেখায় ছড়িয়ে পড়ে,

তখন? তখন কি কেবল ছোটদের?

অবনীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আসল ফারাক কি তাদের কল্পনার জগত আর কল্পনা প্রকাশের ভঙ্গিতে? নাকি তার চেয়ে বড় পার্থক্য তাদের শৃঙ্খলাবোধে? ভেতরকার এক শৃঙ্খলাবোধ?

'সে' রচনায় যেমন শুনতে পাই আমরা রবীন্দ্রনাথের গলা ঃ

> আমাকে নিয়ে আজকাল তুমি যা তা বলছ।
> অসম্ভব গল্পেরই যে ফর্মাশ
> হোক না অসম্ভব, তারও তো একটা বাঁধুনি থাকা চাই। এলোমেলো অসম্ভব তো যে সে বানাতে পারে। *[সে / ৪]*

'হোক না অসম্ভব, তারও একটা বাঁধুনি থাকা চাই।' বিশৃঙ্খলাও একটা শৃঙ্খলে বাঁধা, এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ–এর। রবীন্দ্রনাথ–এর লেখায় থাকে একটা অদৃশ্য 'discipline', আর অবনীন্দ্রনাথ এর বিশ্বাস সৃষ্টির আপনভোলা জগতে। 'সে' লেখার সময় বা তার আরো অনেক আগে কঙ্কাবতীর সমালোচনায় ত্রৈলোক্যনাথ সম্পর্কে (১৮৯২) রবীন্দ্রনাথ কি একই কথা বলেন নি।? এই এক শৃঙ্খলার কথা? '... রচনার বিষয় বাহ্যতঃ যতই অসংগত ও অদ্ভূত হউক না কেন, রসের অবতারণা করিতে হইলে তাহাকে সাহিত্যের নিয়ম বন্ধনে বাঁধিতে হইবে।' সাহিত্যের নিয়ম আছে, বন্ধন আছে, শৃঙ্খলা আছে, তার যথাযথ পরিকল্পনা আছে, শেষ পর্যন্ত উপস্থাপনার নিয়ম আছে। 'বাহ্যত অংশগত' কিম্বা 'অদ্ভূত' কেও সাজিয়ে তোলার বিশেষ পদ্ধতি আছে, এই রবীন্দ্রনাথের চিরকালীন বিশ্বাস। অন্তত লেখার ক্ষেত্রে তো বটেই। ছবির জগতের যেমন খুশি চলার রবীন্দ্রনাথকে লেখায় ততটা পাই কোথায়? অন্যদিকে অবনঠাকুর তার স্মৃতিকথা, বা জীবন স্মৃতিতে সহজকরে বলেন অন্য অনুভূতির কথা। বলেন অন্তর্মহলের গল্প। আর্ট এর সঠিক চেহারা কেমন, তা তিনি কল্পনা করে নেন মনে মনে। অবয়বহীন এক চিন্তাকে বস্তু দিয়ে ধরবার চেষ্টা করেন। যেমন 'ঘরোয়া'তে সহজকরে বোঝাচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথ গোটা আর্ট ব্যাপারটা যেন একটা তিনতলা বাড়ি। তিনটে তলা যেন আর্টের তিনটে স্তর। একতলার মহলে থাকে দাসদাসীরা, তারা ভালো রান্না করে, কাজকর্ম করে, সার্ভিস দেয়, ভালো আসবাব বানায়। দোতলায় বাড়ির বৈঠকখানা। সেখানে গদি কিংখাব দিয়ে সাজানো রসিকদের ঘর। বড় বড় পণ্ডিত কালোয়াতি রস বিচার। আর্টের প্রথম স্তরে গড়ে ওঠে খুঁটিনাটি, পরিশ্রম, নিয়মশৃঙ্খলা দিয়ে। দ্বিতীয় স্তরে গুণীজনের মোহ মুগ্ধতা, বিচার বিশ্লেষণ চলে। দ্বিতীয় স্তর অবধি যেন লেখক / শিল্পী সমালোচক রসিকের, পাঠকের বিচারাধীন। কিন্তু তেতলায় শিল্পীর 'অন্তরমহল'। সেকানে শিল্পী বিভোর। সেখানে সে মা হয়ে শিশুকে পালন করছে। সে মুক্ত। বিচার,

বিশ্লেষণ সমালোচনা, ভালো–মন্দে তার কিছু যায়ই আসে না। 'ইচ্ছেমত সে শিশুকে আদর করছে সাজাচ্ছে।'[২৩] তখন সে খ্যাতি অখ্যাতির বাইরে। কেবল সে আর তার সৃষ্টি। এই বিভোর হয়ে থাকা জগতে কোন মানুষের কাছে তার কোনো দায় নেই।

আর্টের তেতলায় এমন মগ্ন হয়ে থাকা কাকাকে অবনীন্দ্রনাথ একবার দেখতে পান, যখন রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প লেখেন। এই নির্ভয় আদর তখনই এভাবেই ঘোচাতে চেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, যাতে ছবি আঁকা সহজ হয়ে আসে, যেমন 'রবিকা' তাঁকে নির্ভয় করে তুলেছিলেন গল্প বলার সময়। খ্যাতি অখ্যাতি'র বাইরে অবন কেবল অন্তরমহলে বিভোর। প্রাণ খুলে বলেন, 'যারা কেবল শুনতে চায় আপন কথা, থেকে থেকে যারা কাছে এসে বলে গল্প বলো।' অথবা 'বলে যাওয়া চলে কেবল তাদেরই কাছে যারা নির্ভয়ে মনের কথার কেনাবেচার ধার ধারে না।'[২৪] ছোটদের জন্য, কিম্বা বড়দের জন্য অবনীন্দ্রনাথ কেবলই সাজিয়ে তুলেছিলেন নির্ভাবনা আর নির্ভয় এর জগৎ। স্পষ্ট করেই বলেছিলেন শিক্ষা দেওয়ার জন্য নয়, শখ পূরণই শিল্প পালনের আসল কথা। তাই শখের আবার ঠিক রাস্তা বা ভুল রাস্তা কী। 'এর মধ্যে কি আর নিয়মকানুন আছে। এ হচ্ছে ভেতরকার জিনিস, আপনিই সে বেরিয়ে আসে, পথ করে নেয়।'[২৫]

আমরা আরো স্পষ্ট করে বুঝতে পারি ফারাক কোথায়। 'সে' তে যখন রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'অসম্ভব এরও একটা বাঁধুনি আছে।' আর অবনীন্দ্রনাথ উল্টো পথে দাঁড়িয়ে সহজকরে বলেন — 'এর মধ্যে কি আর নিয়মকানুন আছে। ...এ আপনি পথ করে নেয়'। তখন ভিন্ন গতি প্রকৃতির দুই শিল্পীকে দেখতে পাই, ভিন্ন দুটি মন, ভিন্ন দেখবার পথ।

শিক্ষাগন্ধী গল্পকে অবন পছন্দ করেন না, বলেন 'একালে সব কিছুকেই বলে — 'শিক্ষা'। সব জিনিষের সঙ্গে শিক্ষা জুড়ে আছে। ছেলেদের জন্য গল্প লিখবে, তাতেও থাকবে শিক্ষার গন্ধ।'[২৬] আমরা এই পথেই দেখতে দেখতে এলাম শিক্ষাগন্ধী পত্রিকা কিভাবে গড়ে তুলছিল শিশুদের জগৎ, যা 'তথ্য–বিবরণে' ভরে তোলা। 'বালক বালিকাদের উপকারে আসতে পারে' অথবা যখন কোন শিশুসংক্রান্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় যখন ঘোষণা করে 'সংবাদ বা সত্য ঘটনার তথ্য সাদরে গ্রহণীয়', তখন আমরা কান পেতে শুনি অবনীন্দ্রনাথ এর আক্ষেপ আর অনুযোগঃ 'এখন শুনি গল্প কেউ বলে না, বলতেই জানে না, এখনকার লোকেরা লেখে ইতিহাস।'[২৭] ইতিহাস কিম্বা তথ্যের সত্যের চেয়ে আরো বড় কোনো সত্য অবনীন্দ্রনাথ সন্ধান করেছিলেন। ঘরোয়ার শেষ অনুচ্ছেদে যেমন তিনি বলেন 'মানুষ হিসেব চায় না গল্প চায়। ... হিসেব থাকে না মনের ভিতরে ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যায়, থাকে গল্প।'[২৮] আর তার পাঠক শুধু নিরন্তর বলে,

‘চশমা খোলো, গল্প বলো’ ।

চশমার যে আড়ালটুকু আছে, যে আবরণ, যে গাম্ভীর্য, জ্ঞান ভারিক্কি চাল, সেটুকুও তার পাঠক সরিয়ে রাখতে চায়। সব আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে ভেতরের মানুষটি। তিনি বলে যান যা তার শখ তাকে দিয়ে বলিয়ে নেয়, তিনি নিয়মশৃঙ্খলার ধার ধারেন না। ভেতরের কথা নির্ভয়ে নির্ভাবনায় বলে যাওয়ার পাঠক খোঁজেন তিনি। মনে পড়ে যায় ‘সে’ নয় ‘ডাকঘর’ এর অমল এর কথা। পিসেমশাই এর সতর্ক সাবধান বাণী উচ্চারণঃ ‘চুপ করো অবিশ্বাসী কথা কোয়ো না।’

আশ্চর্য এক বিশ্বাস আর কল্পনায় প্রসারিত চোখ নিয়ে যে পাঠক অপেক্ষারত তার জন্য অবনীন্দ্রনাথ লিখে চলেছেন ভূত–পতরীর দেশে, পথে বিপথে, খাজাঞ্চির খাতা, বুড়ো আংলা, অথবা কেবলই যে দেখতে চায়। যেমন করে রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেতেন, তার বালকবয়সের সঙ্গে জুড়ে আছে গল্প শোনা, গল্প বলা, আর কল্পনায় দেখা জগৎ। মনে হয় ‘এ সমস্ত যেন ছেলেবেলাকার রূপকথার জগৎ ... মনে করা যেতে পারে, আমি সেই রাজপুত্র। একটা অসম্ভব প্রত্যাশার সন্ধ্যারাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি।’[২৯]

যেমন করে বাল্যকালের ‘উত্তরের ঘর’ মনে করেন অবনীন্দ্রনাথ। ছাত, সিঁড়ি আলোছায়ার মায়ায় ভরা গ্রীষ্মের দুপুরের পর সিঁড়ির কোণে সন্ধ্যে নামে। সেজবাতির আলোয় বসে একটানা রূপকথা বলে দাসী। দাসীর চেয়ে সেই গল্পকে বেশি মনে থাকে, যেমন করে ঘরোয়াতে তিনি তার স্মৃতিকথা শেষ করেন এই বলে যে ‘দেখো মনে সব থাকে।’ এভাবেই স্মৃতি, ঝিমুনি, আলো আঁধারির মধ্যে দিয়ে তৈরি হয় শিশু অবনের শোনার জগৎ আর প্রবীণ অবনীন্দ্রনাথ এর লেখার জগৎ। এই গল্প শুনতে শুনতেই জেগে উঠত যে মন – সে যা ঘটত আর ঘটতে পারে – সবটাই দেখতে পেত ঃ ‘এমনি দিনের বেলায় রূপকথার সিঁড়ি ধরে পাখির সঙ্গে পেতাম ছাতের উপরের দিকটা। ... ছাতটা তখন ঠেকত ঠিক একটা অন্ধকার মহারণ্য বলে – যেখানে সন্ধ্যেবেলা গাছে গাছে ভোঁদড় করে লাফালাফি, আর আকাশ থেকে জুঁইফুল টিকিতে বেঁধে ব্রহ্মদৈত্য থাকে এ ছাত–ও ছাত পা মেলে দাঁড়িয়ে। এমনি করে গল্পকথার মধ্য দিয়ে কত কি দেখেছি তখন।’[৩০]

পাখির গল্প লেখেন রবীন্দ্রনাথ। রাজার পাখি। তার পেটে কাগজপুরে তাকে শিক্ষা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় শেষমেষ থেমে যায় তার প্রাণ, কেবল বসন্তের বাতাস হুহু করে ওঠে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার জোরাজুরিকে ব্যঙ্গ করেন রবীন্দ্রনাথ। রাজার পাখির গল্প ‘তোতাকাহিনী’ এভাবেই একটি ‘রূপক’ জাতীয় রচনা হয়ে ওঠে, যার মধ্যে পোরা থাকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জরুরি কথা। গল্পের আবেশে মোড়া কাজের

কথা। অন্যদিকে অবনীন্দ্রনাথ কোনো রূপক এর আশ্রয় নেন না। একেবারেই কোনো রচনাতেই নেন না, এমন নয় নিশ্চই কিন্তু তিনি গোটা শরীরটাকে নিয়েই ঢুকে পড়েন রূপকথার মধ্যে। ওটা তখন আর রূপক হয়ে ওঠে না, হয়ে ওঠে না সংকেতবাহী কোনো গল্প। গোটা গল্পটাই চলতে থাকে একটা আদ্যন্ত রূপকথা হয়ে। ওটাই তার কথা বলার ভাষা, ভঙ্গি। রূপকথার ভাষা–ভঙ্গি–আবহ কিম্বা আমেজটুকুই তার গল্প বলার শরীর। তখন তারা কোনা উপকরণ নয়, কোনো জামাও নয়, যাকে বাইরে থেকে পরিয়ে দেওয়া যায়। 'তার স্বভাবতই ছিল রূপকথা করে সব কথা বলা।'[৩১] নির্ভার আর নির্ভাবনার গদ্যভাষা অবনীন্দ্রনাথ এর হাতে তৈরি হল, তাতে রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রভাব রইল না। সেই সময় দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের বিরাট ছায়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে একলা জগতের পথ চলা যার জারি রইল, লীলা মজুমদার তার সম্পর্কে বলেন —'অবনীন্দ্রনাথ এর কোনো উল্লেখযোগ্য অনুকরণ হয় নি।'[৩২] গল্প শোনার জগৎ থেকে শ্রুতি ও স্মৃতি দিয়ে বোনা তার লেখার জগৎ। যেভাবে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলত একটা রূপকথার শোনা, সেই আমেজের মধ্যেই তার গদ্যভাষা আশ্রয় খুঁজল। দক্ষিণারঞ্জনের আগেই পথ পেল নতুন লেখা, গল্প বলার ভঙ্গি যেখানে অক্ষত।

তোতাকাহিনীর প্রসঙ্গে বারবার মনে পড়ছে, অবনীন্দ্রনাথ এর একটি গল্প 'আলোয় কালোয়'। সেও এক পাখির গল্প।

এমন একটি প্রেমের গল্প অবনীন্দ্রনাথ যখন বলেন – তখন পাখি, গাছ, নদী জীবন্ত হয়ে ওঠে তাঁর লেখায়, কাঠের ইঁদুর প্রাণ পেয়ে বাগানে লুকিয়ে পড়ে। এইসব নিয়েই তার গল্প বলার জগৎ কোনো রূপককে আশ্রয় করে না, কোনো বড় দর্শনও নয়। অনাবিল স্নেহের হাসিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া ছিল অবন চিরকালের পাগল।

পাগলামির কারুশিল্পের কথা বলছেন শ্রী শঙ্খ ঘোষ (প্রবন্ধ : পাগলামির কারুশিল্প / কল্পনার হিস্টিরিয়া)। কিন্তু মনে করিয়ে দিয়েছেন, পাগলামিরও শৃঙ্খলা চাই। অনেকটা বড় প্রতিভা না হলে অগোছালো হয়ে পড়ে এক হুলুস্থূল কান্ড বাধায়। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন অনেক আগে কঙ্কাবতীর সমালোচনায় কিম্বা সাহিত্যের প্রবন্ধগুলিতেও ঃ

> যতই অসংযত ও অদ্ভূত হউক না কেন, রসের অবতারণা করিতে হইলে তাহাকে সাহিত্যের নিয়ম বন্ধনে বাঁধিতে হইবে।[৩৩]

অবনীন্দ্রনাথ বারবার ফেলে দিয়েছেন সে শৃঙ্খল। মেতেছেন 'অন্তরমহল' এর তেতলায়। যেখানে শিল্পী মা'এর মত তার শিশুশিল্পকে আদর করে সাজায়। ছোটদের আর বড়দের, সবার জন্য আপনি চলার পথ প্রস্তুত হয়েছে।

শুধু সাহিত্যের নিয়মে শৃঙ্খল না থাকাই নয়, মেতেছেন অবাধ স্বাধীনতায়। স্বাধীনতা না পেলে, শিল্পী কেমন করে উজাড় করে দেবেন নিজেকে। ছেলেবেলার কথা সাজিয়ে তুলছেন ঘরোয়াতে । এই বই এর শেষ অনুচ্ছেদ এ জানাচ্ছেন রাজেন মল্লিকের বাড়িতে একটা নীল সাদায় নকশা কাটা প্রকাণ্ড মাটির জালা দেখেছিলেন বালক অবনীন্দ্রনাথ। তার গা–ময় ফুটো। ভেতরে পোরা থাকত একটা চোঙ। পাখিরা চোঙের একটা ফুটো দিয়ে ঢুকত, আর খাবার খেয়ে অন্য ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যেত। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন — 'অবাধ স্বাধীনতা, ঢুকছে আর বের হচ্ছে। মানুষের মনও তাই। স্মৃতির প্রকাণ্ড জ্বালা, তাতে অনেক ফুটো। সেই ফুটো দিয়েও স্মৃতি ঢুকছে আর বের হচ্ছে। ...'[৩৪] স্মৃতির অবাধ স্বাধীনতা। মনের মধ্যে অজস্র ফুটোতে সে বাসা বেধে আছে, খানিকটা বেরিয়ে আছে, খানিকটা মনের ভেতর থেকে গিয়ে মনকে ঠোকরাচ্ছে। আমাদের লোককথা, উপকথার গল্পগুলো দীর্ঘ সময় ধরে জমা ছিল সমবেত এক স্মৃতিতে। স্মৃতিবাহিত সেই গল্প মুখের অগোছালো ভাষায়, কখনো সামান্য বদল হয়ে, কখনো বাদ গিয়ে আবার কখনো জুড়ে গিয়ে যখন শেষ পর্যন্ত লেখা হয়ে গেল। আমরা বাংলা সাহিত্যে নতুন এক সাহিত্যরূপ পেলাম 'রূপকথা'। আর এই কথকতার ভঙ্গিতে অবনীন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ, পরবর্তীকালে উপেন্দ্রকিশোর, সুখলতা রাও, যখন কলম ধরলেন, আমাদের মনে হল কানে শোনা গল্পই যেন এবার চোখে দেখতে পাচ্ছি।

নিজের 'গল্প লেখার কথা' প্রসঙ্গে লীলা মজুমদার জানাচ্ছেন ঃ

> লিখতে না জানলে গল্প বলতে হয়। আমার সমস্ত শৈশব এইসব নিরক্ষর স্নেহময়ী ঠাইমাদের গল্পে মধুময় হয়েছিল।[৩৫]

স্মৃতিবাহিত মুখে বলা গল্প লেখবার পর যে আশ্চর্য স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গি লেখায় এল, সেই গল্পের মনটাও এমন স্বাধীন যে ইচ্ছেমত চোঙার একদিক দিয়ে ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। স্মৃতি আর লেখার মধ্যে একটা অদৃশ্য যোগ সেদিন থেকেই তৈরি হয়েছিল বলেই বোধ করি রূপকথার গল্পে, সাহিত্যে সে নতুন গদ্যভাষা আমদানি হয়েছিল। পরবর্তীকালে স্মৃতিকথাগুলিতেও তার একটা রেশ রয়ে গেল। বিশেষত মেয়েদের স্মৃতিকথার। সুখলতা রাও এর লেখায় এমন একটা 'লাবণ্যের' খোঁজ পেয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু ঃ

> ছোট–ছোট কথা, মৃদু মৃদু বাক্য, শাদাশিধে ঘরোয়া ধরনে নিচু কথা বলা, 'যেন লেখা গল্পই নয় আসলে, বলা গল্প।[৩৬]

কথাশেষ

কথা শুরু করেছিলাম ত্রৈলোক্যনাথকে দিয়ে। ত্রৈলোক্যনাথ যে শিশুসাহিত্যিক নন

একথা আজআর নতুন করে প্রমাণ করার অপেক্ষা রাখে না, তেমনি উপন্যাস কখন রূপকথার পরিসরে ঢুকে পড়ে, কিম্বা উপন্যাস আর রূপকথার মধ্যে চলতে থাকে এক নিরন্তর যাতায়াত, এইসব কিছুকে অগ্রাহ্য করে কিছু চেনা জানা চিহ্নের লক্ষণ দেখতে পেলেই তাকে বিশেষ একটি সাহিত্যরূপে দেগে ফেলার প্রবণতা, বোধ করি বাংলা সাহিত্যে বারবার দেখা যায়।

১৮৯২ এ কঙ্কাবতী থেকে ১৯২৩ ডমরু চরিত পর্যন্ত ত্রৈলোক্যনাথের লেখায় অজস্রবার পাওয়া যায় 'গল্প' প্রসঙ্গ বা গল্প বলার প্রসঙ্গ। যে কথা বলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ যে নির্ভাবনায় যদি গল্প বলা চলে তবেই গল্প নিজের পথ পায় — ত্রৈলোক্যনাথ কি খুঁজেপেলেন তেমন কোনো পথ? তাহলে এতবার কেন বলেন তিনি 'লোকে পাছে ভাবেন যে, আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা অলীক গল্পকথা, সেজন্য আমাকে ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতে হল।'[৩৭] অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন এরা গল্প লিখতে জানে না, ইতিহাস লিখতে জানে। চাঁইবুড়োর গলায় আমরা সে আক্ষেপ পাই।

— গল্প শুনবে তো তল্প নাও, জল্পনা রাখো – কল্পনা করো – অল্প সল্প।

— কল্পনা করতে তো আমি জানি নে চাঁই দাদা।

— তা ঠিক। তুমি যে আজকালকার ছেলে – হিস্টিরি পড়ে কেউ কখনো কল্পনা করতে পারে?[৩৮]

আজকালকার পাঠক হিস্ট্রির সত্য প্রমাণাদি, তথ্য–বিবরণ চায়। হিস্ট্রি যেদিকে যায়, কল্পনার সত্য অন্যদিকে ছোটে। কল্পনার অধিকতর সত্যকে তার আজগুবী মনে হয়, তাই সাধারণ কৈফিয়ত দিতে হয় লেখককে।

অথবা যদি মনে করি ডমরু চরিতের প্রথম গল্পের শেষ লাইনটুকুঃ 'পাঠকদিগের যদি আমার গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। সে বাঘছাল আমার ঘরে আছে। আমি তাহাদিগকে দেখাইব। তাহাদের সন্দেহ দূর হইবে।'[৩৯] তবু গল্পের শেষে পাঠক যখন তাকে চেপে ধরে —'তুমি যে গল্পটি করিলে, উহার কোনও প্রমাণ আছে?' — তিনি কেবল প্রমাণ দাখিল করার জন্যই ছোটেন তা নয়, বারবার স্মরণ করিয়ে দেন বিশ শতকে অলীক গল্প আর শুনবে না কেউ, তাই 'এ কথা সম্ভব নয়। যাহা সম্ভব নয় আমি তাহাই বলিতেছি।'[৪০]

সত্যি সত্যিই কি ত্রৈলোক্যনাথ গল্পের কৈফিয়ত খুঁজছিলেন নাকি শেষ পর্যন্ত নাকচ করে দিলেন এই প্রমাণ খোঁজার বালখিল্য প্রবণতাকে?

এতক্ষণ যে ত্রৈলোক্যনাথ জোর গলায় দাবী করছিলেন অসম্ভব কথা তিনি বলেন না, অথবা যদি বা বলেন সে প্রমাণ দাখিল করার জন্য তিনি সর্বদাই তৎপর। সব প্রমাণই

তার ঘরে রাখা আছে। সেই কথকই এর জব্বর উত্তর দেন লম্বোদর তথা তার পাঠককে ঃ

'জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ'।[৪১] এই অর্থহীন (Nonsense) বাক্যের পর আর কোন প্রশ্ন জাগে না। প্রমাণ দিতে চাওয়ার তাগিদে তিনি যেন এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেন। ওটাই শেষ কথা, গল্পের আসল কাজযদি হয় মনোহরণ, তবে বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাপকাঠিতে তার বিচার চলে না। রূপকথার গল্প পাঠের পর যে মোহ পাঠককে আবিষ্ট করে রাখে সেই মায়াময় জগৎ কি কোনো অবিশ্বাসের প্রশ্ন তোলে? গল্প শুনতে চাইলে কেবল গল্প শোনো। মনে হয় সেই শুরু থেকেই ত্রৈলোক্যনাথ আর অবনীন্দ্রনাথ খুঁজেবেড়াচ্ছেন কেমন করে গল্প বলতে হবে তার এক নিজস্ব পথ, আর সেই পথেই তাঁরা শ্রুতিবাতির গল্পগুলির ঝোঁকে মিশিয়ে দিলেন তাদের লেখার জগৎকে।

এই গল্প খোঁজার, আর কোন পথে গল্পকে বলতে হবে, সেই ঝোঁকের কথা মনে রাখলে রূপকথার ইতিহাস কেবল বিষয়নির্ভর রাজা রাজপুত্রের গল্প হয়ে থেকে যায় না, দেখা যায় রূপকথা, যা বিশ শতকের নতুন এক লিখিত রূপ, বাংলা গদ্যসাহিত্যের আনাচে কানাচে আগে থেকেই উঁকি দিচ্ছে।

আমার কথাটি ফুরিয়েও ফোরায় না। নটেগাছ মুড়োনোর আগে তাই সংক্ষেপে অগোছালো নানা ভাবনাকে একটা পরিচ্ছন্নতার রূপ দিতে চাই। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নতুন করে গড়ে ওঠা শিশুসাহিত্যের দুটি অভিমুখ লক্ষ্য করা যায়। একটি শিক্ষা, অন্যটি মনোরঞ্জন। শিক্ষা, নীতি জ্ঞানগর্ভ বিবৃতি আগে, মনোহরণ পরে। অথচ মুখের বলায় এই মনোরঞ্জন–এর ধারা চিরকাল জিইয়ে রেখেছিল অজস্র গল্পকে। শিশুসাহিত্য যখন প্রসঙ্গ, তখন লিখিত গল্পও কেবল নীতির, সংস্কার–এর, নিয়ম এর ধর্মপালনের। অথচ পাশাপাশি বয়ে চলা সম্পূর্ণ সেকুলার মনোহরণকারী রোমান্টিক গল্পগুলি তখনো রূপ পেল না। 'মনোহরণ' এল অনেক পরে মূলতঃ রবীন্দ্রনাথ–এর হাত ধরে। 'বালক' পত্রিকার পর 'সাধনা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ খুঁজলেন লোকসাহিত্যের আকরগুলি। ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে মাঝখানে রেখে, আগে রইল ছড়া আর গাথার খোঁজ(১৯০১), আর ১৯০৭ এ রইলেন দক্ষিণারঞ্জন। স্বাভাবিকভাবেই সময়ের এই চেহারাটা জড়িয়ে পড়ল জাতীয়তাবাদী ভাবনার সঙ্গে। লোকসাহিত্যের আলেখ্যাগার এর উদ্দেশ্য মূলত সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্তিক, ভাষাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং'অ্যাকাডেমিক'। মহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবদুল করিম, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রত্যেক উদ্যোগী মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে রইল জাতির আবেগ। এর সব থেকে বড় মুশকিল হল, বাংলা রূপকথার ইতিহাস

খুঁজতে গিয়ে রূপকথাকেও আমরা জাতীয়তাবাদের আবেগে দেখবার একটা পথ পেয়ে গেলাম। রূপকথা সংকলনকে ঘিরে যে উচ্ছ্বাস এর বহর আমরা সেই সময়কার পাঠ–প্রতিক্রিয়ায় নজর করি, তাতে জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গটিকে একেবারেই ঠেলে সরিয়ে দিলাম, এমন নয় নিশ্চই ; কিন্তু সেইটেই সে দেখবার একমাত্র পথ নয়, সেটাও হয়তো সত্যি। গল্প বলার এক ভঙ্গি যা চোরাস্রোতের মত উনিশ বিশ শতকের গদ্যভাষার মধ্যে লুকিয়ে ছিল, কখনো ঘুমে, কখনো জেগে। তথাকথিত পরিশীলিত সাহিত্যের সঙ্গে লোকসাহিত্যের নিরন্তর যাতায়াত কোন পথে শুরু হয়ে গেল তাকে দেশ কালের হিসেবে ধরা শক্ত। ১৯০৭ এর ঠাকুমার ঝুলি প্রকাশকে একটা শীর্ষবিন্দু বলে মনে হল (climax point), যেন রূপকথার জন্মদাতা হিসেবে দক্ষিণারঞ্জনই কেবল স্মৃতিতে রয়ে গেলেন। কিন্তু তার বছর পনেরো আগেই অবনীন্দ্রনাথের লেখা মুখে শোনা গল্পের আদল ফুটে উঠছিল। সংকলন (১৯০৭)এর আগেই তবে সৃষ্টির পথ জেগে উঠল। এই বিরোধাভাসেরও অবসান হয়, যদি মনে করা যায়, ১৯০৭টি সংকলন নয়, সৃষ্টিরই অংশ। দক্ষিণারঞ্জন সংকলক নন, সুলেখক।

রূপকথার ইতিহাসকে বারবারই বিষয়নির্ভর বিশ্লেষণে (content analysis), মোটিফ চর্চার চিহ্ন ধরে পড়তে চাইলে তার একদিকটা দেখা হয় মাত্র। আসলে তার জোরটুকু যত না গল্পে, তার চেয়ে বেশি বলায়। ভঙ্গি আর ভাবনার দিক থেকে, 'ফর্মের' দিক থেকে এক অদৃশ্য ইতিহাস যে বয়ে চলেছে তাকে আর দেখা হয় না।

রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর তাদের ছেলেবেলার জগৎ, স্মৃতিভারাতুর মন, কল্পনার হাত ধরে যাচ্ছিলেন রূপকথার কাছে। কারো কাছে রূপকথা নতুন অর্থগৌরবে রূপক হয়ে ধরা দিল, যেমন রবীন্দ্রনাথ। আর অবনীন্দ্রনাথ–এর গদ্যভাষা আশ্রয় পেল মুখে বলা গল্পের ভঙ্গিতে।

যুক্তি আর আলোকিকতার (enlightenment) যুগে 'unreal' বা আজগুবি কল্পনার উড়ান যেমন শিশুসাহিত্যের তকমা পেল, তেমনি অবনীন্দ্রনাথ বা ত্রৈলোক্যনাথ অনেক দূর পর্যন্ত শিশুসাহিত্যের পুরোধা হয়ে রইলেন। আর রূপকথা কেবল অলৌকিক ঘটনাপ্রবাহ, রাজা রাজপুত্রের গল্প হয়ে শিশু পাঠে ডুব দিল। এসবই বিষয়নির্ভর ভাবনার গোলমাল।

'রূপকথা' প্রবন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'রূপকথা' নামকরণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন 'সমালোচক বোধ হয় উপকথা নামটিই পছন্দ করবেন, কিন্তু রসপিপাসু পাঠক যে রূপকথা নামটির পক্ষপাতী হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।' শুধু রসপিপাসু পাঠক নন এই সাহিত্যরূপটির প্রকৃত মাধুর্য বোঝাতে শ্রীকুমার উল্লেখ করেছিলেন এক বিশেষ আবহ কিম্বা 'ambience' এর কথাঃ 'বর্ষণমুখর রাত্রি', 'স্তিমিত প্রদীপ গৃহ', 'অন্ধকার

গৃহকোণ', 'কল্পনাপ্রবণ' পাঠক আর কথকের 'সরস তরল কণ্ঠস্বর'।[৪২] ওই আমেজআর মায়া দিয়ে ঘেরা বলার ভঙ্গিটুকু এই সব গল্পের আসল সুর। আর মুখে বলা ঐ সুরটুকু শব্দে ধরতে পারাই রূপকথার কাজ। লোককথার গল্পে গল্পের চমক অনেকটা। রূপকথার গল্পটা বরংজানা, বারবার শোনা। এই আবহ, এই সহজকরে সহজকথা বলার দেশীয় ভঙ্গি, রূপকথা ছাড়াও গদ্যসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মধ্যে যাতায়াত তৈরি করেছিল। মোটিফ চর্চা ছাড়া গল্প বলার ভঙ্গির দিক থেকে রূপকথার এই প্রায়–অদৃশ্য সমান্তরাল ইতিহাসকে মনে রাখলে রূপকথা বড়দের নাকি ছোটদের তাই নিয়েও গোল থাকে না আর। রাজপুত্র রাজকন্যার গল্প ছাড়িয়ে, তখন তা গল্প বলার এক লাবণ্যময় ভাষার ও ভঙ্গির আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়, যার পাঠক সকলেই, ছোট বড় ভেদ নেই। আমাদের খোঁজঅনেকটা সেই দিকেই ।

তথ্যসূত্র :

১. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, 'অবনীন্দ্রনাথ : গদ্যের নানা মহলে / অবনীন্দ্রনাথ : স্মৃতি সত্তার উজ্জ্বল উদ্ধার, সম্পাদক : মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (কলকাতা : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় '২০১০) গ্রন্থে সংকলিত ; পৃ:৪৪

২. পরিশিষ্ট, নির্বাচিত ত্রৈলোক্যনাথ, ভূমিকা : রনবীর লাহিড়ী, (কলকাতা : চর্চাপদ, জানুয়ারি ২০১০) পৃ: ২৩৫

৩. নির্বাচিত ত্রৈলোক্যনাথ, পৃ: ২৩৫

৪. নির্বাচিত ত্রৈলোক্যনাথ, পৃ: ২৩৫

৫. পরিশিষ্ট, নির্বাচিত ত্রৈলোক্যনাথ, ভূমিকা : রনবীর লাহিড়ী, (কলকাতা : চর্চাপদ, জানুয়ারি ২০১০) পৃ: ২৪৮। ১৩৬২' কলকাতা দেব সাহিত্য কুটীর থেকে প্রকাশিত সজনীকান্ত দাস এর ত্রৈলোক্যনাথের গল্প' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত। বালক মনোরঞ্জন করবার জন্য ত্রৈলোক্যনাথ কলম ধরেন নি। এই প্রসঙ্গে শ্রী দাস লিখছেন : 'শুধু মানুষের কাহিনী বলিয়া এই কথা বুঝানো কঠিন হইত বলিয়াই আজগুবি ভূতপ্রেত দৈত্যদানব পশুপক্ষীর সাহায্য আমাকে লইতে হইয়াছিল। আমি নিছক ভুতুড়ে গল্প বলিবার জন্য 'বঙ্গবাসী' ও 'জন্মভূমি'র শরণাপন্ন হই নাই। তোমরা ভুল করিয়া আমাকে শিশু–সাহিত্যিকের পর্যায় ফেলিয়া রাখিলে, আর জীবন দর্শনকে জীবনে কাজেলাগাইলে না।'

৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেবী চৌধুরানী, সংসদ গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড (কলকাতা, সংসদ), পৃ: ৭৯৯। ১৮৮৪ তে প্রকাশিত 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে একটি

গ্রাম্য নিরক্ষর রমনী, ব্রহ্মঠাকুরানী বারবার বিভিন্ন রূপকথা বলছে। 'উদাহরণ: ব্রহ্মঠাকুরানী — ''ব্রাহ্মণী? মা মা মা! যেমন ব্রাহ্মণী নয়ান বৌ, তেমনি ব্রাহ্মণী সাগর বৌ — আমার হাড়টা খেলে — কেবল রূপকথা বল — রূপকথা বল! ভাই, এত রূপকথা পাব কোথা?'

৭. সম্পাদক : গোলাম মুরশীদ, বিবর্তনমূলক অভিধান (ঢাকা, বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি, ২০১৪) পৃ: ২৫৮৫; রূপকথা [স উপকথা] বি উপকথা 'ঠাকুরমা আমাদের ঘুমাবার পূর্বে নানা প্রকার রূপকথা কহিতেন।' (হুতোম / ১৮৬১)

৮. https//www.britannica.com/art/children-literature

৯. Encyclopedia Britannica.

১০. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা শিশুসাহিত্যের ছোটো মেয়েরা (কলকাতা : গাঙচিল, ২০০৭), পৃ: ৬২

১১. বাংলা শিশুসাহিত্যের ছোটো মেয়েরা, পৃ: ৪১

১২. মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ : শিশুসাহিত্য (কলকাতা : প্যাপিরাস, জুন, ২০০০), পৃ: ৩৪

১৩. রবীন্দ্রনাথ : শিশুসাহিত্য, পৃ: ৫১

১৪. রবীন্দ্রনাথ : শিশুসাহিত্য, পৃ: ৫০

১৫. বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধ সংকলন, 'বাংলা শিশুসাহিত্য' (কলকাতা : দে'জপাবলিকেশন, ১৯৮২), পৃ: ১৭৪

১৬. পরিশিষ্ট, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছেলেভুলানো ছড়া, প্রবন্ধ: 'মেয়েলি ছড়া', (সম্পাদক : অনাথনাথ দাস ও বিশ্বনাথ রায়) (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২), পৃ: ২৩০; 'আমরা যখন শিশু ছিলাম তখন আমাদের জন্য তাঁহার স্তনে ক্ষীরধারা নিঃসৃত হইয়াছিল – তাহা এই ছড়া এবংরূপকথা – তাহা কোনো বুদ্ধিমানের উদ্দেশ্যকৃত স্বহস্তরচিত নহে, মাতৃস্নেহের অনন্ত প্রস্রবণ হইতে স্বতঃ–উৎসারিত অমৃতধারা।' [মূল রচনা– 'সাধনা' / কার্তিক, ১৩০১]

১৭. ছেলেভুলানো ছড়া, 'প্রাসঙ্গিক তথ্য', পৃ: ২৫৯

১৮. সুকুমার সেন, প্রবন্ধ সংকলন (১), বিশ্বসাহিত্যঃরূপকথা (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪), পৃ: ৭৪৭। 'অপূর্ব কথা' বা 'রূপকথা' বলতে

তিন ধারার গল্প পাওয়া যায়। একধারার গল্প পুরুষের জবানী। দ্বিতীয় ধারার গল্প নারীর জবানী। তৃতীয় ধারার গল্প থেকে নাম দিতে পারি রূপক, তা মাঝে মাঝে বিশেষ লেখকের সৃষ্টি হচ্ছে। এই সৃষ্ট রূপক গল্পগুলি রূপকথার মতো অপৌরুষেয় না হলেও লেখার গুণে রূপকথার সঙ্গে মিশে গিয়েছে।'

১৯. বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধ সংকলন, 'বাংলা শিশুসাহিত্য' (কলকাতা : দে'জপাবলিকেশন, ১৯৮২), পৃ: ১৭৪

২০. বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধ সংকলন, পৃ: ১৭৫

২১. মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ : শিশুসাহিত্য (কলকাতা : প্যাপিরাস, জুন, ২০০০), পৃ: ৩৪

২২. মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ : শিশুসাহিত্য, পৃ: ৩৫২৩. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রচনা সমগ্র–১, স্মৃতিকথা, ঘরোয়া (কলকাতা : দে'জপাবলিকেশন, ২০১৪), পৃ: ২২২৪. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রচনা সমগ্র–১, স্মৃতিকথা, আপনকথা (কলকাতা : দে'জপাবলিকেশন, ২০১৪), পৃ: ১৮৯২৫. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রচনা সমগ্র–১, স্মৃতিকথা, ঘরোয়া (কলকাতা : দে'জপাবলিকেশন, ২০১৪), পৃ: ১৩২৬. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রচনা সমগ্র–১, স্মৃতিকথা, ঘরোয়া, পৃ: ১৩২৭. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রচনা সমগ্র–১, স্মৃতিকথা, ঘরোয়া, পৃ: ১৩২৮. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রচনা সমগ্র–১, স্মৃতিকথা, ঘরোয়া, পৃ: ৮৪২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিন্নপত্র (কলকাতা : বিশ্বভারতী প্রকাশনা, ১৯৭৫), পৃ: ৬৩ / (সংখ্যা–২৩)৩০. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রচনা সমগ্র–১, স্মৃতিকথা, আপনকথা (কলকাতা : দে'জপাবলিকেশন, ২০১৪), পৃ: ৩৬

৩১. বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধ সংকলন, 'বাংলা শিশুসাহিত্য' (কলকাতা : দে'জপাবলিশিং, ১৮৯২), পৃ: ১৮১

৩২. বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধ সংকলন, 'বাংলা শিশুসাহিত্য', পৃ: ১৮২

৩৩. পরিশিষ্ট, নির্বাচিত ত্রৈলোক্যনাথ, ভূমিকা : রনবীর লাহিড়ী, (কলকাতা : চর্চাপদ, জানুয়ারি ২০১০), পৃ: ২৩৫

৩৪. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রচনা সমগ্র–১, স্মৃতিকথা, ঘরোয়া (কলকাতা : দে'জপাবলিশিং, ২০১৪), পৃ: ৮৪

৩৫. লীলা মজুমদার, লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র (১), সম্পাদক : সোমা মুখোপাধ্যায়, 'গল্প লেখার কথা' (কলকাতা : লালমাটি, জানুয়ারি '২০০৩), পৃ: ১৭
৩৬. বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধ সংকলন, 'বাংলা শিশুসাহিত্য' (কলকাতা : দে'জপাবলিশিং, ১৮৯২), পৃ: ১৬২
৩৭. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, নির্বাচিত ত্রৈলোক্যনাথ, ভূমিকা : রনবীর লাহিড়ী (কলকাতা : চর্চাপদ, জানুয়ারি ২০১০) 'লুল্লু', পৃ: ৩১
৩৮. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিরকালের সেরা / (কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ২০১২), পৃ: ২২৩
৩৯. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, নির্বাচিত ত্রৈলোক্যনাথ, (কলকাতা : চর্চাপদ, জানুয়ারি ২০১০) 'ডমরু চরিত' / প্রথম গল্প, পৃ: ৭১
৪০. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, নির্বাচিত ত্রৈলোক্যনাথ, পৃ: ৬৩
৪১. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, নির্বাচিত ত্রৈলোক্যনাথ, পৃ: ১৩২
৪২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রূপকথা' প্রবন্ধ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, একালের প্রবন্ধ পাঠ সঞ্চয়ন : ক'লকাতা, ২০০৯), পৃ: ২৩